মুদ্রক
জ্ঞানাঞ্জন পাল
নিউ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং এণ্ড
পাবলিশিং কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
৪১এ বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা ৬
হইতে মুদ্রিত
১৯৫৯ সাল

প্রকাশক
শ্রীনারায়ণ পাল কর্ত্তৃক
যুগযাত্রী
প্রকাশক লিমিটেড
৪১এ বলদেওপাড়া রোড হইতে
প্রথম প্রকাশিত

বাঁধিয়েছেন
ইস্টএণ্ড ট্রেডার্স
প্রিণ্টার্স এণ্ড বাইণ্ডার্স
২০ কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সূচী

এই প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিনটি রচনা ও 'তারকনাথ পালিত' চরিত-কথার অন্তর্ভূক্ত হইয়া প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য রচনাগুলি "বিজয়া" ও "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল; পুস্তকাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই সংকলন বিপিনচন্দ্র পাল জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতির সাহায্যে অন্যতম স্মারক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। 'সাহিত্য ও সাধনার' ইহা প্রথম খণ্ড।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের অন্য বিবিধ রচনা সমূহ হইতে সংকলিত হইয়া দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্য-সম্মেলন

চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্মেলন অক্ষয়চন্দ্রকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া অতি ভাল কাজ করিয়াছেন। আজ অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্য জগতে একটা পুণ্যস্মৃতির মতন হইয়া পড়িয়াছেন বটে। আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকেরা বা বাংলা লেখকেরা প্রত্যক্ষভাবে অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব যে অনুভব করিয়া থাকেন, এমন বলা যায় না। কিন্তু ইহা এই জগতের চিরন্তন বিধান! পুরাতন সর্ব্বত্র ক্রমে চলিয়া যায়, তার স্থলে নূতন আসিয়া অভিষিক্ত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত পক্ষে পুরাতনের মর্য্যাদা কোনও মতে যে কমিয়া যায়, তাহা নহে। নূতন পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু সমাজের প্রাণের মূলে ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে সাক্ষী-চৈতন্য বিরাজিত আছে, সে জানে পুরাতনের পুরাতত্ত্বকে আত্মসাৎ করিয়াই নূতনের যাবতীয় শক্তি সাধ্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই জন্য ইতিহাস সর্ব্বদা সকল স্থানে পুরাতনের পক্ষপাতী হয়। সম্যক্‌দর্শী সুধীগণ এই কারণে সর্ব্বদা প্রাচীনের প্রতি ভক্তি-অবনত হইয়া থাকেন। চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্মিলনী অক্ষয়চন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিয়া এই সম্যকদর্শন ও ভক্তি-প্রবণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের স্থান কোথায় ও স্থায়িত্ব কতটুকু হইবে, বলা সহজ নহে। অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যে কোনও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন নাই। তাঁর অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার কিম্বা অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতার যে কোন দাবী আছে এমনও বলা অসম্ভব। কিন্তু যেমন চূড়াতেই মন্দির নির্ম্মিত হয় না, সেইরূপ কেবল

অলোকসামান্য প্রতিভা বা অনন্যসাধারণ চিন্তাশক্তি দ্বারাই কোন সাহিত্য বা সমাজ জীবন গড়িয়া উঠে না। বহু বস্তুর সাহচর্য্যে, বহু শক্তির সমবায়ে, বহু গুণের সম্মেলনে, দুনিয়ার যত কিছু ভাল জিনিষ সকল উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ ছোট বড় বহু সাহিত্যিকের সমবেত চেষ্টা ও শক্তি দ্বারা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ একজনই হ'ন। কিন্তু তাঁর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ থাকেন। এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গকে লইয়াই তিনি তাঁর যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা একান্ত অঙ্গাঙ্গী, কোনও মতে আকস্মিক নহে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তিনি বাংলা ভাষাতে, বাঙ্গালীর চিন্তাতে ও ভাবেতে, আদর্শে ও চরিত্রে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন তাহারই প্রেরণায় আজ পর্য্যন্ত বাংলার হিন্দুসমাজ আপনার নিয়তি-পথে চলিতেছে। এরূপ শক্তি সঞ্চার রাজা রামমোহনের পরে এক কেশবচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ করেন নাই।

এ সকল ক্ষেত্রে তুলনায় সমালোচনা করা সঙ্গত নহে। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দু'জনার মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ প্রশ্ন তোলাই অন্যায়। বাঙ্গালী দু'জনের নিকটেই সমভাবে ঋণী। ইঁহারা মূলে একে অন্যকে সাহায্য করিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের আদর্শ ও প্রেরণাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমন বা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কি কেশবচন্দ্র কি বঙ্কিমচন্দ্র দুই মহাপুরুষের কেহই আপন আপন সাঙ্গোপাঙ্গকে ছাড়িয়া এ কাজটী করিতে পারিতেন না। প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতিকে একদিকে ও এক সময়ে কেশবচন্দ্র যেমন আপনার অলোক-সামান্য প্রতিভার প্রেরণা দ্বারা ফুটাইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ আপন আপন সাধন-সম্পত্তি দিয়া কেশবচন্দ্রের প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করিয়া

তুলিয়াছিলেন। এ জগতে একাকিত্বের মধ্যে মৃত্যুর অবসাদই কেবল পাওয়া যায়, জীবনের প্রেরণা মিলে না। যেমন কেশবচন্দ্র আপনার সাঙ্গোপাঙ্গগণের গুণে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার সহচর ও সহযোগী-গণের শক্তি ও সাধনাকে আশ্রয় ও আত্মসাৎ করিয়া এমন অনন্য-সাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেন। যে কেহ আপনার উপযোগী লোক বাছিয়া লইয়া নিজের পার্শ্বে টানিয়া আনিতে পারে না। আর যে কেহ আপনার পারিপার্শ্বিক শক্তি ও সাধনাকে এমন ভাবে আত্মসাৎ করিয়াও লইতে পারে না। এরূপভাবে যাঁহারা দুর্লক্ষ্য সূত্রে চারিদিক হইতে উপযোগী সহচরদিগকে আপনার কাছে টানিয়া আনিতে পারেন ও তাহাদের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে তাহাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে পারেন, তাঁহারাই সত্য সত্য মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজটী যেমন ভাবে ও যতটা পরিমাণে করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করিতে পারেন নাই। বোধ হয় এ আকর্ষণী শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে রাজা রামমোহনেরও ছিল। তিনিও কতকগুলি প্রতিভাশালী লোককে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে কালের ভিতরকার খবর আমরা তেমন জানি না। রাজার প্রখর প্রতিভার আওতায় পড়িয়া তাঁর সমসাময়িক প্রতিভাশালী বাঙ্গালীগণের প্রতিভা লোকসমাজে আত্মপ্রকাশের অবসর পায় নাই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কতকটা আমাদের সময়ের লোক; তাঁকে দেখিয়াছি, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছি। তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের সমগ্র ইতিহাসটা একরূপ আমাদের চক্ষের উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদিগের সকলকে না হউক, অনেককে আমরা স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছি ও জানিয়াছি।

আর সেই জন্য বাংলা দেশটা যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভার নিকটে ঋণী, সেইরূপ তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়চন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির নিকটে কতটা পরিমাণে যে ঋণী ছিল, ইহার সংবাদও আমরা কতকটা রাখিয়াছি। আর বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রই যেন, আমার মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিলেন। তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই অবসরমত সাহিত্যসেবা করিতেন। একমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্যসেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্য এক সময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনের" প্রধান সহায় হইয়া উঠেন। সে কালের "বঙ্গদর্শনে" অক্ষয়চন্দ্রের কোন কোন রচনা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিয়া সন্দেহ হইত।

গ্রন্থ-সমালোচনার ভার অনেকটা, বোধ হয়, অক্ষয়চন্দ্রের উপরেই অর্পিত ছিল। সম্ভবতঃ, কোন কোন সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ছাপ'ও থাকিত। সেই সব সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে তাঁহাদের মত এমন করিয়া প্রখরে-মধুরে মিলাইতে, এমন করুণ-কঠোর কষাঘাত করিতে আর কেহ পারিতেন কি না সন্দেহ। "মালঞ্চ-নিবাসিনী মধুসূদন সরকারস্য"কে এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই। আর আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "হেলেনা কাব্যের" ভূমিকায় যে অত্যুক্তি ছিল, তাহার প্রতি "বঙ্গদর্শন" যে তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিল,—সে বিদ্রূপের মধ্যে কতবিধ রস উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও মনে আছে। ফলতঃ, বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" প্রচার বন্ধ হইয়া অবধি বাংলা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর দেখিতে পাই নাই। নব-পর্য্যায় "বঙ্গদর্শনে" শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন সে ধারা রাখিয়াছিলেন, আর মাঝে মাঝে "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয় সে পুরাতন স্মৃতিকে

জাগাইয়া তুলেন। কিন্তু সচরাচর আজ বাংলা সাহিত্যে সমালোচকের ধর্ম্মাসনে তেমন একটী যোগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ইংরেজের আদালতে যেমন মোকদ্দমার সংখ্যা যত বাড়িয়া যাইতেছে, তত সরাসরি বিচারের পদ্ধতিটাও অযথা পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে; বাংলা সাহিত্যেও গ্রন্থকারের সংখ্যা যত বাড়িয়া যাইতেছে, তত সরাসরিভাবে সাহিত্য সমালোচনার প্রবৃত্তি এবং রীতিও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এখন অনেকস্থলে সমালোচকের পদে মো-সাহেব অধিষ্ঠিত। এ অবস্থায় সাহিত্যের সম্মান রক্ষা বাস্তবিক দায় হইয়া পড়িয়াছে। আর চারিদিকের এই অবনতিধারা প্রত্যক্ষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র যে কাজটা এক সময়ে এমন অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে করিতেন, তার মূল্য ও মর্য্যাদা যেন আমার চক্ষে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তার মৌলিকতা না থাকিলেও, ভাষার একটা অনন্যসাধারণ শক্তি ও সরলতা আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর এ বস্তুটী তাঁর নিজস্ব। কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শব্দ-সম্পদের পরিচয় দান করিয়াছেন, গদ্য লেখাতে এক সময় অক্ষয়চন্দ্র কিছু পরিমাণ সে সম্পদের প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন। সুললিত, সহজবোধ্য, বিবিধ রসোদ্দীপক শব্দধারার সৃষ্টিকুশলতায় বাংলা লেখকদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের নকলনবিশ অনেক হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও হন নাই। সকল সময়ে যে অক্ষয়চন্দ্রের শব্দপ্রবাহ ঠিক সার্থক হয় তাহা নাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু শব্দের যে একটা নিজস্ব মোহিনী প্রভাব আছে, সুযোজিত ধ্বনিধারার যে একটা মাদকতা সঞ্চারিণী শক্তি আছে, এও তো সত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই রসাত্মক বাক্য যোজনা করিতে যাইয়া স্বল্পবিস্তর পরিমাণে এই মাদকতা সঞ্চারিণী শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন। এ অধিকার যাঁর নাই, তিনি চিন্তাশীল

হইতে পারেন, বহু জ্ঞানের অধীশ্বর হইতে পারেন, বহু তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হইতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিক হইতে পারেন না। স্বর্ণকারের ব্যবসায় যেমন স্বর্ণ লইয়া, সাহিত্যিকের ব্যবসায় সেইরূপ শব্দ লইয়া। যার যে পরিমাণে স্বর্ণ থাকে, সে যেমন স্বর্ণকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাজনপদ বাচ্য হয়; সেইরূপ যে লেখকের শব্দ-সম্পদ যত বিশাল ও সেই শব্দরাশির যথাযোগ্য যোজনায় নিপুণতা যাঁর যত বেশি, সাহিত্য-জগতে তিনি তত শ্রেষ্ঠ—সাহিত্যাচার্য্য উপাধি পাইবার উপযুক্ত। এই হিসাবে অক্ষয়চন্দ্রকে ন্যায়তঃই সাহিত্যাচার্য্য বলিতে পারা যায়। বাংলা গদ্যরচনায় এমন তুবড়ী ফুটাইয়া তুলিতে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।

এ জগতে সকল বস্তুর উপযোগিতা যেমন কমিয়া আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে উপকারিতাও ক্রমে কমিয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্রের গদ্য রচনার প্রণালীটী আজ হয়ত ঠিক তেমন ভাবে আর উপযোগী নহে। দেশের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। লোকচিত্ত এখন শব্দের মোহিনী মায়া কাটাইয়া গভীরতর ভাবে অর্থের অন্বেষণে ছুটিতেছে। ক্রমে এ ভাবটা বাঙ্গলা সাহিত্যেও স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য বাংলা গদ্যের আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে বদলাইয়া যাইতেছে। সাহিত্যের শক্তি এককালে ধ্বনিগত ছিল, এখন ক্রমে ক্রমে চিন্তাকে, গবেষণাকে, যুক্তিবিচারকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে লেখার অন্তরালে চিন্তার জোর আছে, তাহাই এখন শক্তিশালী লেখা বলিয়া গণ্য হয়। কেবল ভাবের, রসের, শব্দের ফোয়ারার উপরে সাহিত্যসম্পদ ও সাহিত্যিকের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব নহে। এই কারণে অক্ষয়চন্দ্র যে গদ্যরচনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার মূল্যও আজিকার বাজারে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। আজিকার বাংলা সাহিত্যে গদ্য রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের পর

অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, কি কালীপ্রসন্ন, ইঁহারা সকলেই সাহিত্যে মহারথী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলাভাষায় গদ্য রচনার ক্ষমতাটা যে কত বড়, ইহা রবীন্দ্রনাথ যেমনটা প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাদের কেহ তেমনটা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এমন নিরেট গাঁথুনি বাংলা ভাষার শক্তিতে যে সম্ভব ইহা লোকে পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমক্ষে অক্ষয়চন্দ্রের গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি আজ অনেকটা মলিন হইয়া পড়িলেও এক সময়ে তিনিও যে শব্দ লইয়া বিচিত্র রসের খেলা খেলিয়াছিলেন, আর সে খেলাতে বাঙ্গালী চকিত, পুলকিত হইয়া গিয়াছিল ইহা অস্বীকার করা যায় না। সে জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টিতে আজিও অক্ষয়চন্দ্র অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য ভোগ করিতেছেন। তবে, তাঁর গদ্যের আদর্শটা যে আজিকালি লোকচক্ষে কতকটা হেয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহা বস্তুতঃ অক্ষয়চন্দ্রের দোষ নহে। দোষ তাঁর অনুকরণকারীদের। ইহাদের না ছিল অক্ষয়চন্দ্রের ধারণা, না ছিল তাঁর চিন্তার শক্তি বা রসানুভূতির প্রাখর্য্য, —ছিল কেবল কান। তাই তাঁহারা কেবল কানের জোরে অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যরচনার প্রণালীর অনুকরণ করিতে যাইয়া, তাহার ভিতরকার শক্তি ও সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। অকৃতী অথচ গুরুমর্য্যাদা-লোলুপ শিষ্যের হাতে পড়িয়া অনেক গুরুর যেমন দুর্দ্দশা ঘটে, শিষ্যের আতিশয্য দেখিয়া লোকের গুরুর প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, অক্ষয়-চন্দ্রের আকৃতী অনুসরণকারীদের হাতে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভারও সেই দশা ঘটিয়াছে। এ উৎপাতের আবির্ভাব না হইলে আজি পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের পূর্ব্ব স্থান হয়ত বজায় থাকিত।

অন্যান্য দেশে জ্ঞানালোচনার জন্য বড় বড় সভা-সমিতি আছে। আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল রাষ্ট্রীয় কোলাহল লইয়াই বিব্রত ছিলাম। দেশের অন্যান্য অভাব ও অভিযোগের, ভাব ও কর্ম্মচেষ্টার প্রতি দৃক্‌পাত

করিবার অবসর ছিল না। এ বিষয়ে বাংলা দেশে যে পরিমাণ অনবধানতা দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের অন্য প্রদেশে তাহা দেখা যায় নাই। মহারাষ্ট্রে বহুকাল হইতে গ্রীষ্মের প্রাক্কালে একটা করিয়া বিদ্বজ্জন সমাগম হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে দেশের মনীষীগণ বিবিধ বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার সহায়তা করিবার চেষ্টা করেন। এ সকল সভাতে বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমবেত হইয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করেন। মান্দ্রাজেও কিছুকাল হইতে এই পদ্ধতিটী প্রচলিত হইয়াছে। সেখানেও প্রতি বর্ষে বসন্ত সময়ে কোনও পর্ব্বাহকে আশ্রয় করিয়া এক একটা বিদ্বজ্জন সমাগম হয়। এবারে এই উপলক্ষে অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের এ সকল সভা কতকটা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ এসো-সিয়েশনের ছাঁচে গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আমরা এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করি নাই। কিন্তু বিগত কতিপয় বৎসর হইতে বাংলা সাহিত্য সম্মেলন সেরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ এই বার্ষিক সম্মেলনটীকে আমাদের নিজেদের সাহিত্য ও সাধনার একটী বিশেষ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এখানে দেশের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ সমবেত হইয়া বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করিবেন ; চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে, বিজ্ঞানের রাজ্যে, কাব্যের রাজ্যে, মৌলিক গবেষণায় ও রসসৃষ্টি-ব্যাপারে, দর্শনে, ইতিহাসে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে, স্বজাতির সমস্ত জীবনের সাধনার বিবিধ বিভাগে, বৎসর কাল মধ্যে আমরা কতটা উন্নতি লাভ করিয়াছি, কোন্ দিকে কতটা নূতন চেষ্টা হইয়াছে, কোন্ দিকে কতটা সংশোধন আবশ্যক, এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবেন। এইরূপে ইংরেজ মনীষী সমাজে ব্রিটিশ এসোসিয়েশন যে

স্থানটা অধিকার করিয়া আছে, বাংলার সুধী মণ্ডলী মধ্যে আমাদের এই সাহিত্য সম্মেলন ঠিক সেই স্থানটী অধিকার করুক, এই দিকেই এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটীকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা কেহ কেহ হয় ত ইতিমধ্যেই এইভাবে এই সাহিত্য সম্মেলনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আর যাঁরা এই আদর্শ মনে লইয়া চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্য-বিবরণের বিচার আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁরা সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে যে কিয়ৎপরিমাণে নিরাশ হইবেন না, এমন বলিতে পারা যায় না। অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিম-যুগের এক জন প্রধান কর্ম্মী। তাঁর চক্ষের উপরে বাংলায় এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি সাক্ষাৎভাবে এ যুগের জন্মকর্ম্ম সকলই অবগত আছেন। আমরা তাঁর নিকটে বিগত চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের ভিতরকার বিকাশের ইতিহাসটী শুনিব, আশা করিয়াছিলাম। "বঙ্গদর্শন" প্রথমে বাংলা দেশে ও বাংলাভাষাতে যে নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তোলে, তার পরে ক্রমে সেই ভাব, সেই শক্তি, সেই চিন্তা, পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁর আপনার "নবজীবনে" ও বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচারে" যে আকার ধারণ করে, কেমন করিয়া "বঙ্গদর্শনের" প্রথম বয়সের বহির্মুখীনতা ক্রমে আপনাকে খুঁজিতে যাইয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়া তুলে, এবং ক্রমে পুনরায় আত্মস্থ হইয়া, নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য লালায়িত হয়, কেমন করিয়া একদিকে "নবজীবন" ও অন্য দিকে "প্রচার" এই প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাসরূপে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; তারপর ক্রমে আজ সেই প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ণতর, গভীরতর, বিশদতর আকারে, সমধিক সত্যোপেত হইয়া, এক বিরাট ও সর্ব্বতোমুখী সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে—বাঙ্গালীর প্রাণপণ চেষ্টার এই চল্লিশ বৎসরের

পবিত্র পুরাণ গাথা অক্ষয়চন্দ্রের মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হইব, ভাবিয়াছিলাম। এ কথার সঞ্চয়রূপে, বাংলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে এক অক্ষয়চন্দ্রই বাঁচিয়া আছেন। এই আশা করিয়া যাঁহারা তাঁহার চট্টগ্রামের অভিভাষণটী পড়িতে বা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁরা যে হতাশ হইয়াছেন, ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু এ হতাশ সঙ্গত বোধ হয় না। সকলে সকল কাজ করিতে পারে না। বঙ্কিমযুগের সাহিত্য সমালোচনার কাজ এ বয়সে অক্ষয়-চন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। তবে তিনি একটা কাজ করিতে পারিতেন। কেবল এবারতের দিক দিয়া চল্লিশ বৎসরের সাহিত্যের গতি কোন্ দিকে, ভাল কি মন্দ, উন্নত না অবনত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র যেমন ভাবে উপদেশ দিতে পারিতেন, তেমন ভাবে উপদেশ দিবার শক্তি ও অধিকার বাংলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আর কাহারও বড় বেশী আছে কি না সন্দেহ। এই এবারতে—ইংরেজীতে ইহাকে style বলে,—অক্ষয়চন্দ্র এক সময়ে অসাধারণ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন। আজকাল তো বলিতে গেলে দু'চার জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখাতে ভিন্ন এবারত বস্তুটা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যের যে অপকার করিতেছেন সাহিত্য সম্মেলন হইতে তাহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল। আর অক্ষয়চন্দ্রের এ বিষয়ে ব্যবস্থা দিবার যতটা অধিকার আছে, আর কোনও জীবিত সাহিত্যিকের সে অধিকার নাই। অক্ষয়চন্দ্র এ বিষয়ে যে একেবারেই কোন আলোচনা করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু আলোচনাটা আরো গভীর, আরো পরিস্ফুট হইলে ভাল হইত।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে এবারতের বা styleএর একটা দিক মাত্র দেখাইয়াছেন। ভাষা প্রাণময়ী হইবে। দেশের, অর্থাৎ

দশের প্রাণবস্তু সংস্পর্শে ভাষা আপনার প্রাণশক্তি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের প্রাণের চাবিটী হাতে লইয়া সাহিত্যিককে সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কথাটা খুব সত্য। তোড়ায় বাঁধা ফুলের ক্ষণিক রূপ যতই থাকুক না কেন, প্রাণগত রস যে নাই, ইহা সকলে জানেন। ধার করা কথাও কতকটা এইরূপ। তার রস থাকে না, দুদণ্ড পাঠককে মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু চিরদিনের জন্য স্নিগ্ধ করিবার শক্তি তার থাকে না। ইংরেজ ক্লান্ত হইলে, ক্লিষ্ট হইলে 'ডিয়ার' 'ডিয়ার' বলিয়া হাই তুলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ডিয়ার কথাটা খুবই মিষ্টি হইতে পারে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা 'মা' বলিয়া হাই তুলি, গা ভাঙ্গি, দুঃখক্লেশে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি। এই 'মা' কথা আমাদের প্রাণ জুড়াইবার সঙ্কেত। এখানে প্রিয় বলিলে চলিবে না, জননী বলিলেও চলিবে না। 'মা'ই বলিতে হইবে। এইরূপ ভাবের রাজ্যে, প্রাণের রাজ্যে, ভিতরকার আদান-প্রদানের ব্যাপারে, দেশের ও দশের চিরাভ্যস্ত প্রাণের কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, না করিলে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা একটা জীবন্ত বস্তু আর থাকিবে না। রসসাহিত্যে—কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে,—এই প্রাণের ভাষার সেতুকে আশ্রয় করিয়া দেশের প্রাণের সঙ্গে একটা জীবন্ত যোগ রাখিতে হইবে। এখানে জলধরপটল-সংযোগে কোনও রূপরসের বর্ণনাতে রসভঙ্গ হইবে। নিতান্ত পরের ধনে পোদ্দারি করিয়া যে সকল লেখক সহসা সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা খ্যাতি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তাঁরা ছাড়া আর কোন কবি বা ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার, বোধ হয় এ উদ্ভট চেষ্টাও করেন না।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অভিভাষণে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টীর অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন। এ ছাড়া যে সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, ইহা যেন তিনি ভুলিয়াই গিয়াছেন, মনে হয়।

ভাষা ভাবের বাহন। ভাবে অশেষবিধ বৈচিত্র্য থাকে। কোন একটা রসকে ধরিয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কখনও ঐশ্বর্য্য, কখনও মাধুর্য্য; কখনও বীভৎস, কখনও বাৎসল্য; কখনও রুদ্র, কখনও করুণ। এখন প্রশ্ন এই যে দেশের ও সমাজের নিম্নস্তরে এ সকল বিবিধ রসের প্রকাশ যথাযোগ্য ভাবে ভাষায় হয় কি? রসের যন্ত্র ভাষা নহে,—স্নায়ু ও পেশি। অশিক্ষিত চাষী যখন রুদ্রভাবে উন্মত্ত হইয়া পড়ে তখন তার হাতের ও বুকের পেশি সকল ফুলিয়া উঠে, তার চক্ষু জবাফুলের মত হয়, মুখের ভাব সংহারমূর্তি ধারণ করে; কিন্তু রুদ্ররসের উপযোগী শব্দপ্রবাহ সে ফুটাইয়া তুলিতে পারে কি? হদ্দমুদ্দ "আয় তো" বলিয়া সে বাহ্বাস্ফোট করিয়া ছুটিয়া যায়। আচ্ছা, এই চিত্রটী সাহিত্যে ফুটাইতে গেলে, নিতান্ত সহজ, গ্রাম্যজন বোধসুলভ ভাষায় কি তাহা সম্ভব হইবে? সমাজের নিম্নস্তরের অন্তরটা শিশুর মতন; তাদের ভাবের ভাষাও স্বল্পবিস্তর শিশুরই ভাষা—আধ আধ। তাদের মুখে ঐ ভাষাতে সকল রস ফুটিয়া উঠে, আর ফুটিয়া উঠে, কেবল শব্দ সহায়ে নয়, কিন্তু মুখের ভাবে, চলনের বা দাঁড়ানর ভঙ্গীতে। ভাষাতে তো আর এই সকল আনুষঙ্গিক রসগুলিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। করিতে গেলে, হয় এ সকলের লিপিচিত্র আঁকিয়া তুলিতে হইবে, না হইলে, যে রস ইহারা কতকটা কথায়, কতকটা হাবেভাবে প্রকাশ করে, সেই রসের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন। অক্ষয়চন্দ্র যে এ সকল কথা জানেন না বা বুঝেন না, এমন অসঙ্গত কথা কল্পনা করি না। কিন্তু তিনি এই অভিভাষণে এদিকে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই বলিয়া, এবারতের বা styleএর সমালোচনা হিসাবে তাঁর বক্তৃতাটী অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

আর এবারতের বা styleএর সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র যে দিকটা দেখাইয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও আংশিক সত্য মাত্র। ক্ষেত্র বিশেষেই

তাঁর বিধান শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য, সকল ক্ষেত্রে তাঁর কথা মানিয়া চলিতে গেলে ভাষার গতির দিকটা, উন্নতির দিকটা, জটিলতার ভিতর দিয়া যে কলাকুশলতা প্রকাশিত হয়, সেই দিকটা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, এমন কথা বলিতে পারি না; অক্ষয়চন্দ্রের মতন লেখক নিজেও এ কথা বলিবেন, বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এ ছাড়া এবারতের আর একটা দিক আছে। সে দিকটার প্রতি লক্ষ্য করিয়াও অক্ষয়চন্দ্র কোন উপদেশ দেন নাই। বাংলা ভাষার এবারতটা বাংলায় হইবে, আর কোনও দেশের হইবে না, ইহা সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু কথাটা যে কত বড়, সকল বাঙ্গালী সাহিত্যিকও ইহা ভাল করিয়া সর্ব্বদা ধারণা করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ। মানুষের চেহারা যেমন, ভাষার এবারত সেইরূপ। অর্থাৎ সকল মানুষের রক্ত মাংস পেশি অস্থি মজ্জা মেদ, শরীরের উপাদান ও শরীরের প্রকৃতি মোটের উপরে এক হইলেও, এই সকল উপাদান ও এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক মানুষের মুখে বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে, যাহা অপর সকল মানুষে ফুটে না। শরীর সম্বন্ধে এই বিশেষত্বটুকু সে ব্যক্তির নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব। সেইরূপ মনেরও একটা বিশেষত্ব আছে। যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে ছাঁচে ফেলিয়া সে জগতের অশেষবিধ বস্তু ও বিষয়কে আপনার মনের ভিতরে গুছাইয়া রাখে এবং যে আকারে এ সকল বিষয় সে অন্যের নিকটে প্রকাশ করে,—এ সকলের ভিতর দিয়া তাহার মনের নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বস্তু ফুটিয়া উঠে। এইটাই তার নিজের 'এবারত' বা style; এই এবারতটা মানুষের মনের, চিন্তার, ভাব-রাজ্যের, অন্তর্জগতের চেহারা। কাহার চিন্তার ছাঁচটা কিরূপ, কাহার মনের শক্তি ও গতি কোন্ দিকে, তাহার এবারতের ভিতর দিয়া তাহা ধরা পড়ে। বাঙ্গালীর একটা মন আছে—অর্থাৎ সমষ্টিগত এই যে বঙ্গসমাজ, বহু শতাব্দ সহস্রাব্দ ধরিয়া এই ভারতবর্ষে যে সমাজ অপরাপর ভারতীয় সমাজ হইতে একটু পৃথক হইয়া, একটা

তের

কিছু অল্পবিস্তর বিশেষত্ব লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ও বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মনের চেহারায় সেটা গাঁথিয়া আছে। বাংলা সাহিত্যে খাঁটি বাংলা এবারতে বা style-এ বাঙ্গালীর এই মানসিক চেহারাটী ধরা পড়ে। এই চেহারাটী যেখানে নাই, বাংলা এবারত, অর্থাৎ বাঙ্গালীর খাঁটি সাহিত্যের ছাঁচটীও সেখানে নাই।

এ ছাঁচটী আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যেন উলট্‌পালট্‌ হইয়া যাইতেছে। বিদ্যা যখন হজম হয় না, তখন সাহিত্যে অজীর্ণ লক্ষণ সর্ব্বত্র দেখা গিয়া থাকে। বিদেশের বিদ্যা শিক্ষায় কোনও অপরাধ হয় না। না শিখিলে বরং স্বদেশের প্রাণবস্তুর সঙ্গে স্বজাতির সাহিত্যও সংকীর্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ বিদ্যা কোনও দেশ বা জাতির নিজস্ব বস্তু নহে।. এই একাদশ ইন্দ্রিয় আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড,—এই লইয়াই তো সকল প্রকারের লৌকিক বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলিও সকল মানুষের আছে, আর এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সকলেরই ভোগদখলে রহিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাটা সকলেরই সম্পত্তি। কিন্তু বিদেশের বিদ্যা শিখিলেই তো হয় না, হজম করা চাই। এই হজমটা যারা করিতে পারে না, তাদের হাতেই বিদেশের বিদ্যাপ্রভাবে স্বদেশের অন্তঃপ্রকৃতি ও স্বদেশী সাহিত্যের এবারত, উভয়ই নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এ বিপদটা আমাদের বড় বেশী। আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরাও সকল সময়ে, সকল বিষয়ে এ বিপদের হাত এড়াইতে পারেন নাই। বিদেশী ধর্ম্মের প্রভাবে, আমাদের মধ্যে আধুনিক স্বাদেশিক ধর্ম্মসাহিত্যে, এমন কতকগুলি শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার, লোক-প্রকৃতির ও সমাজপ্রকৃতির কোন সঙ্গতি নাই। শব্দ ধার করা যে টাকা ধার করার মতন একটা অতিশয় গুরুতর অন্যায়, এমন কথা

বলি না। কিন্তু যখন নিজেদের সাহিত্য ও শাস্ত্রভাণ্ডারে সে অর্থ-প্রকাশক শব্দ পাওয়া যায় না, তখনই তো শব্দ ধার করা প্রয়োজন। এ ভাবে ধার করাতে কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে বিষয়ে নিজেদের কোন দৈন্য নাই, সে বিষয়ে পরের ভাষা ধার করিয়া আনিলে, নিজের শব্দসম্পদ বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, ভাব-রাজ্যে এবং জ্ঞানরাজ্যে পর্য্যন্ত একটা অলীকতা আসিয়া পড়ে। শব্দ বস্তুর বা রসের সঙ্কেত বই তো আর কিছু নয়। যদি বস্তু আমাদের না থাকে, যে শব্দ যে রসের সঙ্কেত সে রসের আস্বাদন যদি আমাদের ভাগ্যে কখনও না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে শব্দ আনিলেই তো চলিবে না। সে শব্দকে সত্যোপেত ও শক্তিশালী করিতে হইলে, সে বস্তুটীকেও লাভ করিতে হইবে, সে রসেরও সাধনা করা আবশ্যক হইবে। আর এইখানেই যত বিপদ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা জাগিয়া উঠে। এ বিপদে পড়িয়া কোন কোন দিকে কেবল বাংলা এবারত ও বাংলা সাহিত্য নয়, কিন্তু বাঙ্গালীর চরিত্র পর্য্যন্ত শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথাটা বিশদ করিবার চেষ্টা করিতে পারি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বাংলা ভাষাকে নানা দিকে খুব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ কথা সকলে স্বীকার করিবেন, যদিও বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতন কেশবচন্দ্রের সাহিত্য-সেবার বড় একটা বেশী উল্লেখ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্য দিকে কেশবচন্দ্র বাংলা ভাষায় এমন দু চারিটা নূতন শব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহা খাঁটি বাংলা নয়, যার ভিতরকার বস্তুর বা রসের সঙ্গে আমাদের ভিতরকার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বা ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। "বিবেক-বাণী" এই জাতীয় একটা কথা। আমাদের চিন্তাতে ও সাধনায় বিবেক শব্দের

প্রতিষ্ঠা বহুকাল হইতে হইয়াছে। উপনিষদ্ যুগে ইহার প্রথম পরিচয় পাই। কিন্তু সে বস্তু আর কেশবচন্দ্র যাকে বিবেক বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ বস্তু এক নহে। আমাদের বিবেক সাধন-রাজ্যের একটা অতি নিগূঢ় ও প্রত্যক্ষ বস্তু। অনিত্য সংসারকে নিত্য পরমার্থ হইতে পৃথক বলিয়া জানার নাম আমাদের বিবেক। এ বিবেক অতি দুর্লভ বস্তু। লাখের মধ্যে একেরও এ বস্তু লাভ হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু কেশবচন্দ্র বিবেক বলিয়া যে বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলেন, সকলেই তার দাবী করে। এ বস্তু ইংরেজের কন্‌সিয়াব্স্ (conscience); আমাদের বিবেক নয়। ইংরেজ যাকে conscience বলে, আমরা তাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া আসিয়াছি। বিবেক ইহার অনেক উপরকার রাজ্যের কথা। আর কেশবচন্দ্র ইংরেজের conscienceকে আমাদের প্রাচীন সাধনার বিবেকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমাদের আধুনিক ধর্ম্ম-চিন্তার ও ধর্ম্মসাধনার যে একেবারে কোন অনিষ্ট করেন নাই, এমনই বা বলা যায় কি ?

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বহুবিধ অভিনব শব্দসম্পদে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। এ ঋণ বাঙ্গালী চিরদিন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করিবে। কেশবচন্দ্রের মতন, তিনিও দু' একস্থলে বিদেশীয় ভাবের অনুকরণে এরূপ দু' একটী শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর বিশ্বমানব কথাটার উল্লেখ করা যায়।

ইংরেজী 'হিউম্যানিটি' রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানব। এই হিউম্যানিটি বস্তু আধুনিক য়ুরোপীয়েরা কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়াছেন, সাধনাবলে লাভ করেন নাই। ইহা কৃষ্ণত্ব, শুক্লত্ব প্রভৃতির মতন একটা গুণবাচক শব্দ মাত্র, নিজস্ব বস্তুত্ব বা স্বরূপ ইহার কিছু নাই। অথচ, য়ুরোপীয়েরা হিউম্যানিটি বলিয়া যে তত্ত্বকে হাতড়াইতেছেন, তাহা আমাদের সাধনাতে বহুকাল হইতে, নারায়ণ নামে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই নারায়ণ

গুণবাচক শব্দ নহে, বস্তুবাচক শব্দ। নারায়ণ abstraction নহেন, কিন্তু person; আমাদের নারায়ণ কথা থাকিতে য়ুরোপীয় হিউম্যানিটিকে আমাদের ভাষাতে ও চিন্তাতে বিশ্ব-মানব রূপে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রয়োজন আছে কি? এইরূপ অকারণে পরের সাধা সুর ভাঁজিতে গিয়া নিজের অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠতর স্বরগ্রামকে ভুলিবার উপায় করিয়া আমরা অলক্ষ্যে ভাষার ও সাহিত্যের কোন অমঙ্গল সাধন করিতেছি কি না ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র এদিক দিয়া এবারতের (style) আলোচনা করেন নাই। এই সকল দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তিনি আপনিই আপনার সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। ভাষা দেশের লোকের প্রাণসংস্পর্শে প্রাণময়ী হইবে, কথাটা অতি সত্য। কিন্তু প্রাণবস্তু তো আর স্থবির নহে। নিয়তই যে এই প্রাণ স্ফুরিত হইতেছে; নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য নূতন শক্তি ও নিত্য নূতন রস আকর্ষণ করিয়া, দেশের প্রাণবস্তু উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এই প্রাণ যে সেই মহাপ্রাণের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যেই সেই অনাদি অনন্ত বিশ্ব-প্রাণ, অনাদি অনন্তরূপে লুকাইয়া আছেন। এই জন্য এই প্রাণ ক্রমে বাড়িয়া উঠে। এ বিকাশের বিরাম নাই, শেষ নাই। সুতরাং যতটুকু ফুটিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। যা এখনও ফোটে নাই—কিন্তু ফুঠিবার উপক্রম করিতেছে, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং, কেবল স্থিতির দিক নয়, গতির দিক দেখিয়াও সাহিত্যকে চলিতে হইবে। দেশের পুরাভ্যস্ত কথার সাহায্যে, দেশের প্রাণের অন্তঃপুরে সাহিত্যকে যেমন প্রবেশলাভ করিতে হইবে, সেইরূপ আবার ভিতরের ও বাহিরের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের চিত্তে যে সকল নূতন নূতন ভাব ও আদর্শ স্ফুটনোন্মুখ হইতেছে, অভিনব শব্দ সৃষ্টি

সত্তের

করিয়া, সে গুলিকেও ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, নতুবা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত রাখা অসাধ্য হইয়া পড়িবে। অক্ষয়চন্দ্র এ সকলই জানেন ও বুঝেন; তবে তাঁর অভিভাষণে এদিকটা তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। লোকে কি জানি তাঁহাকে ভুল বুঝে, এই জন্যই এ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল। অক্ষয়চন্দ্র যদি নিজে আর একদিন সাহিত্যের এই গতির দিকটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, আমরা সকলে কৃতার্থ হইব।

টাইট্যানিকের তিরোধান

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের ব্যবধানটা যে কত সূক্ষ্ম ও সামান্য, সংসার মোহ বিভ্রান্ত মানুষ সকল সময়ে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই বুঝি বিধাতাপুরুষ মাঝে মাঝে টাইট্যানিকের তিরোধানের মত লোমহর্ষণ বিধানের ব্যবস্থা করিয়া, আত্মবিস্মৃত জনগণের আত্মচৈতন্যকে জাগাইয়া দেন। সভ্যতা বলিতে আমরা আজি কালি যে বস্তুকে বুঝিয়া থাকি, তাহা একান্তই ইহ-সর্ব্বস্ব। এই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের চিন্তা ও কল্পনার উপরে প্রত্যক্ষ পুরুষকারের প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়া, অপেক্ষাকৃত "অসভ্য" প্রাচীন সমাজে দৈবের উপরে যে একটা ঐকান্তিক নির্ভর ছিল, তাহা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তার অদ্ভুত উদ্ভাবনীশক্তি, তার আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতা, যতই তাহাকে বাহিরের শক্তিপুঞ্জের প্রভু ও নিয়ন্তা করিয়া তুলিতেছে, যতই মানুষ আপনার বুদ্ধিবলে দেশ কালের নৈসর্গিক ব্যবধান, জল স্থলের অনুল্লঙ্ঘনীয় অন্তরায়, বহিঃপ্রকৃতির অনুকূলতা প্রতিকূলতা, এ সকলকে তুচ্ছ করিয়া আপনার অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইতেছে, ততই তার আপনার উপরে নির্ভরটা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে। এই নির্ভরটা আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ। সুতরাং এরূপ সভ্যতা যে "আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতা" হইবে, ইহা বিচিত্র কি? এ সভ্যতাকে মাঝে মাঝে এরূপ ভাবে নাড়া না দিলে, তার চৈতন্যোদয় হইবে কেন?

য়ুরোপ ভাবিতেছিল যে সে আপনার অলৌকিক অধ্যবসায় ও অসাধারণ বুদ্ধির জোরে নিসর্গের প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জকে করায়ত্ত করিয়া

ক্রমে মানুষকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া তুলিবে। টাইট্যানিকের তিরোধানে, ক্ষণিকের জন্য তার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা এ পথে মৃত্যুকে জয় করিতে যাই নাই। আমরা যাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া জানি, তিনি যোগেশ্বর, তিনি মহাবৈরাগী, তিনি দ্বন্দ্বাতীত, মৃত্যু ও অমৃতে তাঁর সমান জ্ঞান, তপঃপ্রভাবে জীব শিব তাঁর ভিতরে এক হইয়া গিয়াছে। আমাদের মৃত্যুকে জয় করিবার পথ ছিল—যোগের পথ, ভোগের পথ নহে ; ত্যাগের পথ, লোভের পথ নহে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

"যে সকল কামনা এই মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সমুদায় যখন একান্তভাবে পরিত্যক্ত হয়, তখনই মর্ত্ত্য অমর হয়, এবং এইখানেই ব্রহ্মকে ভোগ করিয়া থাকে।

আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাকেই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র পথ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি। "ত্যাগেনৈবমৃতত্বমনাশুঃ" কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পাওয়া যায়, তার আর অন্য পথ নাই, ভারতের আর্য্যসভ্যতা ও সাধনার ইহাই সার কথা ও শেষ কথা। জগতের সকল সাধু ও সিদ্ধপুরুষেরাই এ কথার সত্যতার ও সারবত্তার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টীয় সাধনায়ও এ কথাটা নূতন নহে। যিশুও এই ত্যাগের পথই দেখাইয়া গিয়াছেন, ভোগের পথ দেখান নাই। "তোমার যা' কিছু তৎসমুদায় বিকাইয়া দিয়া, আমার অনুগামী হও,"—"যদি সে জীবন পাইতে চাও, তবে এ জীবন বিসর্জ্জন দাও"—"কালকার জন্য চিন্তা করিও না, আজিকার ভাবনাই আজিকার জন্য যথেষ্ট" ;—খৃষ্টের এ সকল প্রসিদ্ধ উপদেশ,—এবং পরিণামে যে ভাবে তিনি এই মহাত্যাগ যজ্ঞে আপনার পবিত্র দেহ উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, আর এইরূপ ভাবে দেহ রাখিয়া আপনার "পুনরুত্থান" বা রিসরেক্সনের

(Resurrection) ভিতর দিয়া, খৃষ্টীয়ান মণ্ডলীকে তিনি স্বয়ং অমৃতত্বের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও আমাদেরই এই প্রাচীন ও সার্ব্ব-জনীন ঋষিপন্থা। ইহাই মুক্তির একমাত্র পথ—"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"।

টাইট্যানিকের তিরোধান সংসার-মোহ-বিভ্রান্ত য়ুরোপীয় সমাজকে, অপূর্ব্ব কলাকুশলতা সহকারে, এই সনাতন ঋষি-পথ ও পুরাতন যিশুপথই দেখাইয়া দিয়া গেল। যারা আজন্মকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল ভোগের পথ ধরিয়া চলিয়াছিল, যাহাদিগকে দুনিয়ার লোক ইহ-সর্ব্বস্ব বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে আসুরী-সম্পদ বলিয়াছেন, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আসুরীভাবের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার আহরণ করিতে যাহারা আপনাদের সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হইত, সেই সকল লোককে বুকে লইয়াই টাইট্যানিক তার এই মহাপ্রয়াণে যাত্রা করিয়াছিল। আধুনিক সমাজের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা ও বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতা মিলিয়া এই বিপুল অর্ণবযানখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। একদিন য়ুরোপ হইতে আটল্যান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় যাইতে এক পক্ষ কাল লাগিত। ক্রমে তাহা এক সপ্তাহে আসিয়া দাঁড়ায়; বৎসর দুই কাল হইল, এ ব্যবধান আরও কমিয়া গিয়াছিল। দুইটি প্রসিদ্ধ ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করে; একের নাম "কিউন্যার্ড" (Cunard), অপরের নাম "হোয়াইট ষ্টার" (White Star)। কিউন্যার্ড কোম্পানীর মরিট্যানিয়া (Mauritania) নামক নূতন জাহাজ প্রথমে, পাঁচ দিন কয়েক ঘণ্টায়, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। সপত্নী কোম্পানীর এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া, হোয়াইট ষ্টার (White Star) কোম্পানীর পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই প্রতিযোগিতার প্রেরণাতেই

"টাইট্যানিকের" জন্ম হয়। পাশ্চাত্য জগতে প্রতিদিনই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত ও নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে। "মরিট্যানিয়া" যখন নির্ম্মিত হয় তার পরে, এই দুই বৎসর কি তিন বৎসর কালের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যের বা যন্ত্রের যাহা কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হইয়াছে, "টাইট্যানিক" সে সকলের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আয়তনে ও গতি শক্তিতে, সাজসজ্জায় বিচিত্রতায় ও ভোগবিলাসের আয়োজনে, সকল বিষয়ে "হোয়াইট ষ্টার" কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ "টাইট্যানিক"কে অর্ণবপোতের সেরা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আরোহীগণের সুখের ও সখের ব্যবস্থা করিয়াই ইঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। জাহাজখানিকে এমনভাবে গড়িয়াছিলেন, তার ভিতরে এমন সকল কলকৌশল রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে ইহার ডুবিবার কোনও আশঙ্কাই ছিল না। আপনাদের অসাধারণ কৃতিত্বের উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, নিরতিশয় স্পর্দ্ধা সহকারে যাত্রিগণকে সর্ব্বপ্রকারের সুখ-সৌখিনতার ও ভোগবিলাসের লোভ দেখাইয়া, এবং সমুদ্র যাত্রার সর্ব্ববিধ বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে একান্ত অভয় দান করিয়া, আপনাদের নিয়ন্তৃ সমিতির বা Board of Directors'এর সভাপতি মহাশয়কে সঙ্গে দিয়া, যাত্রী কর্ম্মচারী ও নাবিক সকলে মিলিয়া প্রায় তিন হাজার স্ত্রীপুরুষ লইয়া, হোয়াইট ষ্টার কোম্পানী টাইট্যানিককে আটল্যান্টিকের বুকে ভাসাইয়া দিলেন। প্রহরে প্রহরে অদৃশ্য ঈথর স্পন্দনকে আশ্রয় করিয়া, তারহীন তড়িৎ বার্ত্তা সাগর বক্ষঃস্থ টাইট্যানিকের গতিবিধির সংবাদ চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। বিপুলকায় জাহাজখানি নির্ভয়ে ও সদর্পে সমুদ্র তরঙ্গ ভেদ করিয়া যেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া চলিতেছিল, তার বুকের উপর দ্বিসহস্রাধিক নরনারীও সেইরূপ ভয়ভাবনা বিরহিত হইয়া, হাস্যপরিহাসে, নাচে গানে, দিন কাটাইতেছিলেন। এইরূপে এই বিশাল প্রাণের পসরা সাজাইয়া

"টাইট্যানিক" আনন্দে আপনার গন্তব্যের দিকে, দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল।

কিন্তু তার কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহার যে গন্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সে গন্তব্য লাভ তাহার ভাগ্যে ছিল না। সভ্যতার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্ব হরণ করিবার জন্য, বিষয়বিমূঢ় জনগণের চিত্তে সাড়া আনিবার জন্য, পুরুষকারের উপরে যে একজন আছেন এই জ্ঞান জন্মাইবার জন্য, সংসার মোহ বিভ্রান্ত স্বরূপ ভ্রষ্ট সভ্য জীবের স্বরূপ চৈতন্যের সঞ্চার করিবার জন্য, কামোপভোগপরায়ণা সভ্যতা ও সাধনার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য, "নান্যদস্তীতিবাদী" ইহ-সর্ব্বস্ব জনগণের প্রাণে অমৃতত্বের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য, ভোগসর্ব্বস্ব সমাজকে ত্যাগের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য—বিধাতাপুরুষ টাইট্যানিকের আর এক গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। টাইট্যানিক সে সাংঘাতিক নিয়তি প্রাপ্ত হইয়াই আপনার চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

সমুদ্রে তরঙ্গ নাই। আকাশে মেঘ নাই। অগণ্য নক্ষত্ররাজি দশদিক্ পূর্ণ করিয়া হীরার হাট খুলিয়া বসিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণপক্ষের নিশির অন্ধকারও নাই। শান্ত সুপ্রসন্ন প্রকৃতিমুখে নির্ম্মমতার আভাস মাত্র নাই। অপূর্ব্ব রচনা-কৌশলগুণে বিপুলকায় অর্ণবপোতের জলমগ্নের আশঙ্কার লেশমাত্র নাই। তড়িতালোকসমুজ্জ্বল, বিবিধ কলাকুশলপূর্ণ প্রমোদ-প্রয়াস-মুখরিত ইন্দ্রপুরীর ন্যায় অর্ণবপোত আশ্রয় করিয়া দ্বিসহস্রাধিক আরোহী নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে অকূল জলরাশি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। কেহ বা শুইয়াছে, কেহ বা শয়নের আয়োজন করিতেছে। কেহ বা ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে, কেহ বা সঙ্গীতালাপ করিতেছে। কেহ বা আরামচৌকিতে বসিয়া নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতেছে, আর কেহ বা ডেকের উপরে পাদচারণ করিতে করিতে প্রণয়ীজনের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। কেহ বা ধনের, কেহ বা প্রেমের,

কেহ বা প্রতিযোগিতার, কেহ বা জ্ঞানের, কেহ বা ললিতকলার, কেহ বা সখ্যের, কেহ বা সখের ভাবনা ভাবিতেছে। দুনিয়ার সকল ভাবনার বোঝা লইয়া টাইট্যানিক শান্ত সমুদ্রাম্বুরাশি ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে— নাই কেবল সে বিচিত্র পসরায় এক মৃত্যুর ভাবনা। সহসা যখন মরণের ডাক পড়িল, জাহাজের কল যখন বন্ধ হইয়া গেল, আরোহীগণের প্রাণরক্ষার জন্য লাইফ্ বোট (Life-boat) বা জীবনতরণীগুলিকে জলে নামাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইল, সকলকে ডেকে যাইয়া দাঁড়াইবার জন্য যখন কাপ্তানের হুকুম জারী হইল, তখনও সকলের প্রাণে সাড়া পড়িল না। কালের ভেরী বাজিল, তথাপি অনেকে ক্রীড়াকৌতুক ছাড়িল না, অনেকের গীতবাদ্য থামিল না। বিজ্ঞানের প্রামাণ্যকে নষ্ট করিয়া, সভ্যতার অসাধারণ কৃতিত্বাভিমানকে চূর্ণ করিয়া, স্থির সমুদ্রে, নির্ম্মল আকাশ তলে, টাইট্যানিক যে সহসা অতলে ডুবিবে বা ডুবিতে পারে, অনেকের মনে এ কল্পনারও উদয় হয় নাই। প্রথমকার এ ভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পরে যখন বিপদ যে সত্য, মৃত্যু যে সন্নিকট এ বিষয়ে তিল পরিমাণ সন্দেহের আর অবসর রহিল না, তখন যে কেন এই দ্বিসহস্রাধিক আরোহী এবং নাবিকেরা ভয়বিক্ষিপ্ত হইয়া, শৃঙ্খলমুক্ত পশুর ন্যায় কে কাহাকে মারিয়া আপনাকে বাঁচাইবে সে চেষ্টায় জাহাজখানিকে কলহকোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিল না, এ রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, যে আধুনিক সভ্যতা হয় মানুষকে সর্ব্বপ্রকারের সাধারণ মানব ধর্ম্ম বিরহিত করিয়া কাষ্ঠলোষ্ট্রে পরিণত করে, না হয় দেবত্বে উন্নীত করিয়া তোলে। এ সকল কি মোহের না মোক্ষের লক্ষণ? টাইট্যানিকে যাহা দেখিলাম তাহা কি জড়ত্ব না বীরত্ব।

আর এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে আমরা য়ুরোপকে সচরাচর ইহসর্ব্বস্ব বলিয়াই মনে করি। য়ুরোপ ভোগের সন্ধানই পাইয়াছে,

ত্যাগের নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও লাভ করিতে পারে নাই, অনেক সময় আমরা এরূপই ভাবিয়া থাকি। সুতরাং টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ যাহা দেখাইল, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমরা সহজে ধরিয়া উঠিতে পারি না। কখনো মনে হয়, আমরা য়ুরোপকে যাহা বুঝিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আর কখনো মনে হয়, বুঝি বা টাইট্যানিকের তিরোধানের যে কাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে কল্পিত। ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বধারণাও একান্ত মিথ্যা নহে; আর আজ যে ছবি দেখিলাম, তাহাও নিতান্ত কল্পিত নহে। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা যে ত্যাগের পথ ধরিয়া যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া চলিয়া আসিয়াছে, য়ুরোপ যে সে পথের সন্ধান পাইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহা প্রমাণ হয় না। ভারতের পথ চিরদিন ত্যাগের পথ। য়ুরোপের পথ চিরদিন ভোগের পথ। ভারতের যতই কেন আত্মবিস্মৃতি জন্মাক না, সে কখনো একান্তভাবে য়ুরোপের ভোগের পথ ধরিতে পারিবে না। আর য়ুরোপের যতই কেন ক্ষণিক শ্মশান-বৈরাগ্যের উদয় হউক না, সেও কখনো ভারতের এই প্রাচীন ত্যাগের পথ ধরিতে পারিবে না। ভারত যদি য়ুরোপের অদ্ভুত অভ্যুদয় দেখিয়া তাহার ভোগের পথ ধরিতে যায়, তাহাতে আত্মচরিতার্থ লাভ করা দূরে থাকুক, সে নিষ্ফল প্রয়াসে তাহার ভাগ্যে কেবল আত্মঘাতী পরধর্ম্ম লাভই ঘটিবে। আর য়ুরোপও যদি ভারতের প্রাচীন পারমার্থিক সম্পদের অতিলৌকিক শক্তিদর্শনে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পরধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হয়, সে প্রয়াসও তাহার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াই উঠিবে।

ফলতঃ কি ভারতের কি য়ুরোপের পক্ষে এইরূপ পরধর্ম্মানুশীলনের কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ মানবপ্রকৃতির মৌলিক একত্বনিবন্ধন, মানুষ আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া, নিষ্ঠাসহকারে যে পথেই চলুক

না কেন, পরিণামে সেই মূল প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হইবে; ইহার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। সকল নদীই যেমন একই সাগরগর্ভে যাইয়া আপনার চরিতার্থতা লাভ করে, সেইরূপ সকল মানবীয় সাধনাই ঋজুকুটিলভাবে নানা পথ অতিক্রম করিয়া, পরিণামে যে মনুষ্যত্বে মানবপ্রকৃতিমাত্রের সার্থকতা লাভ হয় সেই মনুষ্যত্বকে প্রাপ্ত হয়। য়ুরোপের প্রবাদে একটী কথা আছে—সকল পথই চরমে রোম নগরে যাইয়া পৌঁছায়। সেইরূপ সার্ব্বজনীন মানব ইতিহাসের সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্বপ্রকারের মানবীয় সাধনা চরমে এক পরম মনুষ্যত্ব বস্তুকে ফুটাইয়া তুলে। ত্যাগে যেমন ত্যাগের পরিসমাপ্তি হয় না, নিষ্কাম ভোগে যাইয়াই ত্যাগ আপনার সার্থকতা লাভ করে; সেইরূপ ভোগও আপনার চরিতার্থতার জন্যই ক্রমে ত্যাগের পথ আশ্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং আদিতে যে ভোগ কাম্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়া চলে, ক্রমে ত্যাগের পথ ধরিয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মধ্যে আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে হয়।

আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার আত্যন্তিক ভোগলালসা আপনার চরিতার্থতার জন্যই যে সকল যমনিয়মাদির প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছে, টাইট্যানিকের তিরোধানকালে তাহারই শ্রেষ্ঠতম ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আধুনিক ভোগের আয়োজন করিতে হইলে, বহুলোকের সমবেত শ্রম ও সাহচর্য প্রয়োজন হয়। টাইট্যানিক আপনি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এত বড় বিপুলকায় অর্ণবযান পরিচালনার জন্য বহুলোকের আবশ্যক হয়। এই বহুসংখ্যক নৌ-কর্ম্মচারী ও নাবিকদিগের পরিচালনার জন্য প্রত্যেকের কর্ম্মাকর্ম্মের একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই সকল ব্যবস্থার উপরে যখন এত আরোহীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনমরণ নির্ভর করে, তখন এসকলের বিন্দুমাত্র বিপর্য্যয় যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য কঠোর শাসনেরও প্রয়োজন হয়। এক এক খানি সমুদ্রগামী জাহাজ এক একটী ক্ষুদ্র

রাজ্যের মত। কাপ্তান সেই রাজ্যের রাজা। জাহাজের কর্ম্মচারী এবং আরোহী সকলকেই কাপ্তানের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হয়; না চলিলে জাহাজ পরিচালনা অসম্ভব এবং এত লোকের প্রাণরক্ষা অসাধ্য হইয়া পড়ে। সেনাশিবিরে প্রত্যেক সেনাপতির যে প্রভুত্ব ও অধিকার, সমুদ্রগামী জাহাজের কাপ্তানের সেইরূপ অধিকার ও প্রভুত্ব। এখানে নাবিক এবং আরোহী সকলেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—জাহাজের কাপ্তান। যাহারা এই সকল জাহাজে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে ও এই সকল জাহাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে, তাহারা সকলে জাহাজের বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে ও কাপ্তানের আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। আর এই অভ্যাসের ভিতর দিয়া তাহারা এক প্রকারের সংযম শিক্ষাও করিয়া থাকে। এই সংযমের গুণেই আসন্ন মৃত্যুর মুখেও টাইট্যানিকের দ্বিসহস্রাধিক আরোহী ও নাবিক ভয়বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই।

এ তো গেল বিশেষ ব্যবস্থার ও বিশেষ বিধানের কথা। ইহার অন্তরালে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার কতকগুলি সাধারণ কর্ম্মও বিদ্যমান ছিল। এই সভ্যতা ও সাধনা, যতই কেন ভোগপ্রধান হউক না, ইহার পারমার্থিক দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও, পরমার্থপরতা বস্তুতঃ সামান্য নহে। বিধাতার রাজ্যে অত্যন্ত ভোগী যে সেও কখনও নিতান্ত একাকীত্বের মধ্যে কিছু ভোগ করিতে পারে না। জনসমাজ একদিকে যেমন ত্যাগের, অন্যদিকে সেইরূপ ভোগেরও একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। একান্ত একাকী হইয়া যে থাকে, সে যেমন ত্যাগের অবসর পায় না, সেইরূপ ভোগের আয়োজনও করিতে পারে না। ভোগের মাত্রা যতই বাড়িয়া যায়, ততই দশজনকে মিলাইয়া, দশজনের শক্তিসাধ্যের সমবায়ে সেই ভোগের আয়োজনও করিতে হয়। আর এইরূপে দশজনে মিলিয়া কোন কিছু করিতে গেলে প্রত্যেকের স্বার্থপরতাকে,

নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই, কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে হয়। এই সমবায়ের সূত্র ধরিয়াই য়ুরোপ এতটা অভ্যুদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আর দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে যাইয়া য়ুরোপীয় সমাজে এক প্রকারের পরার্থপরতারও বিকাশ হইয়াছে। এইরূপে দেশের জন্য ও দশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার একটী সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই য়ুরোপের জাতীয় চরিত্রে একটা অতি উদার বিশ্বপ্রেমের আদর্শও ফুটিয়া উঠিয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধান কালে আমরা এই সকলের একটা অতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। ত্যাগের পথে যাইয়া ভারত মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল। ভোগের পথে যাইয়া য়ুরোপ মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে। ভারত বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা সাধন করিয়া আপনি সুখদুঃখের অতীত হইয়াও জগতের সুখকে আপনার সুখ ও জগতের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ ও ভোগ করিবার নিগূঢ় সঙ্কেত লাভ করিয়াছিল। এই মহাপরিনির্ব্বাণের তত্ত্ব য়ুরোপ জানে না। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থার সংবাদ আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা রাখে না। কিন্তু আপনি সুখ চাহে বলিয়া, য়ুরোপ অপরকেও সুখী করিতে চাহে এবং আপনি দুঃখের তীব্র হলাহল পান করিতেছে বলিয়া, সে বিষের যাতনা জানে এবং তাহার জন্য জগতের দুঃখীতাপীর সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারে এবং সেই দুঃখ ও সেই বেদনা উপশম করিবার জন্য কখনও কোন শ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করিতে বিমুখ হয় না। টাইট্যানিকের তিরোধানে কি করিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে হয়, তাহা দেখিলাম। কেমন করিয়া অপরের সুখে সুখানুভব ও অপরের দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়, তাহাও দেখিলাম। কাম্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে যাইয়াও যে অসাধারণ সংযমের প্রয়োজন হয় এবং এই অপরিহার্য্য সংযমের মধ্য দিয়াই যে অতি উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বও ফুটিয়া উঠিতে পারে

এবং এই পথে যাইয়াও যে সুকৃতিসম্পন্ন লোকে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ লাভ করিতে পারেন, টাইট্যানিকের তিরোধানে ইহাও দেখিলাম। এ সকল দিকেই আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। টাইট্যানিক আধুনিক য়ুরোপের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির অন্যতম নিদর্শনরূপে গঠিত হইয়াছিল এবং য়ুরোপীয় কর্ম্মিগণের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য সগর্ব্বে সাগরবক্ষে ভাসিয়াছিল। আর য়ুরোপের ইহসর্ব্বস্ব ভোগপ্রধান সাধনার মূলেও সে ভাগবতী লীলাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাহারই ভিতর দিয়াই শ্রেষ্ঠতম যোগশক্তি ও মোক্ষসম্পদ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, ইঁহা প্রমাণ করিয়াই টাইট্যানিক অতল সাগরতলে অন্তর্হিত হইয়াছে। টাইট্যানিকের তিরোধানে য়ুরোপ মহীয়ান্ ও জগৎ নূতন শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

উইলিয়াম টি ষ্টেড্

বাল্যকাল হইতে ইংরেজী গ্রন্থে অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজের চরিতাখ্যান পড়িয়াছি। ইংরেজ সমাজের মাঝখানে বসিয়াও ছোট বড় অনেক ইংরেজের সঙ্গে নানা কর্ম্মে, নানা ভাবে, মেশামেশি করিয়াছি। কিন্তু উইলিয়েম টি ষ্টেডের মত খাঁটি ইংরেজ অতি অল্পই দেখিয়াছি।

"খাঁটি" ও "ভাল"

যে বস্তু ঠিক আপনার স্বরূপেতে থাকে তাহাকেই আমরা খাঁটি বস্তু বলি। কিন্তু খাঁটি হইলেই যে সে বস্তু সকলের চক্ষে ভাল হইবে এমন বলা যায় না। দ্রব্যগুণসম্বন্ধে বোধ হয় যা খাঁটি তাই ভাল, আর যা ভাল তাই খাঁটি হয়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা যায় কি? আমরা কোনো দ্রব্যের নিজের প্রকৃতির দ্বারাই তাহার সত্যিকার ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের বেলা আমরা তাহার ভিতরকার প্রকৃতির সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সন্ধান করি না; আমাদের নিজেদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, রুচি ও অভ্যাসের দ্বারাই তাহার ভালমন্দের বিচার করিয়া থাকি। সকল মানুষ যদি সমান হইত, তবে এরূপ বিচার অসঙ্গত হইত না। কিন্তু মানুষ যে সকল সমান নয়। সকল জলই যেমন সমান, জলে জলে যে বেশী কম দেখি, তাহা জলের ভিতরকার প্রকৃতিগত নহে, জল ছাড়া অন্য কোনো ধাতুকণা বা লবণাদি তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জলের গুণের তারতম্য উৎপাদন করে; সকল সোণাই যেমন সমান; সকল পারদ গন্ধকই যেমন সমান; সকল মানুষ তো আর সেরূপ সমান নয়; মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতা

তা' তার প্রকৃতিগত। সে প্রকৃতির সঙ্গে বাহিরের কোন বস্তু মিশিয়া গিয়া এ সকল ভেদাভেদের সৃষ্টি করে নাই। আর মানুষে মানুষে এই প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বলিয়াই প্রকৃতপক্ষে একের যা' ধর্ম্ম অপরের তাই ধর্ম্ম হয় না, একের ভালমন্দের দ্বারা অপরের ভালমন্দের বিচার সঙ্গত হইতে পারে না; সুতরাং কোনো মানুষ খাঁটি হইলে যে সকলের বিচারে সে ভাল হইবে, আর সকলে কাহাকেও ভাল বলিলে যে সে খাঁটি হইবে, এমন কোনো কথা নাই। বরং এ সংসারে দশজনে যা'কে ভাল বলে অনেক সময় সে খাঁটি হয় না; নিজের স্বরূপেতে থাকা তার পক্ষে একান্তই কঠিন হইয়া পড়ে।

ভাল ইংরেজ ও খাঁটি ইংরেজ

এমন ইংরেজ দেখিয়াছি যাঁহাদিগকে আমাদের চক্ষে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। এমন বিস্তর ইংরেজ সর্ব্বদাই তো দেখিতে পাই, যাঁহাদিগকে আমাদের চক্ষে নিতান্তই মন্দ ঠেকে। কিন্তু আমরা যাঁহাকে ভাল বলি তিনিই যে খাঁটি ইংরেজ আর আমরা যাঁহাকে মন্দ দেখি তিনিই যে খাঁটি ইংরেজ নহেন, এমন কথা বলা যায় কি? বরং আমরা যে ইংরেজকে বড় ভাল বলি তার পক্ষে খাঁটি ইংরেজ না হওয়ার সম্ভাবনা কি বেশী নাই? লাট রিপণ আমাদের চক্ষে বড় ভাল ইংরেজ ছিলেন। তাঁর মত এমন ভাল লাট বহুদিন ভারত শাসন করিতে আসেন নাই। কিন্তু রিপণ-চরিত্রে যে বস্তু দেখিয়া আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম সে বস্তু ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্ব নহে। রিপণের শান্ত মূর্ত্তি, সদাপ্রসন্ন ভাব, সমাহিত চরিত্র, ধর্ম্মভয় ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া আমরা ইংরেজ আভিজাত্যের পরিচয় পাই নাই, বরং আমাদের সনাতন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথঞ্চিৎ আভাস পাইতাম। আর তারই জন্য রিপণকে আমাদের এতটা ভাল লাগিয়াছিল। রিপণ লোক অতি মহৎ ছিলেন, সন্দেহ নাই;

কিন্তু খাঁটি ইংরেজ ছিলেন, এমন কথা বলিতে পারি না। রিপণের মত, ভারত বন্ধু স্যার হেন্‌রি কটনও লোক অতি ভাল। রিপণকে দেখিয়া যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ভাব মনে আসিত, কটনকে দেখিয়া তাঁর কথাবার্ত্তায় ভাবস্বভাবে, কতকটা সেইরূপ আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশ্বমানব-ভক্ত, বাঙ্গালী আন্দোলনকারী বা এজিটেটরদের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। ফলতঃ কটন যখন আমাদের চিফ্ কমিশনার ছিলেন, তখন শিলং-এর সিভিলিয়ান্ সমাজ, পরিহাসচ্ছলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে "বাবু চিফ্" বলিয়া ডাকিতেন। আর তারই জন্য বস্তুতঃ কটনকেও আমাদের এত ভাল লাগে। কিন্তু রিপণ, কটন, এঁরা কেউ যে খাঁটি ইংরেজ, এ কথা বলিতে পারি না।

ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্ব

ইংরেজের ইংরেজত্ব বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, সে বস্তু যাঁর ভিতরে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেবল তাঁহাকেই খাঁটি ইংরেজ বলা যাইতে পারে, অন্যকে নহে। দুধ যখন সম্পূর্ণরূপে আপনার স্বরূপে থাকে, তখনই কেবল তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়। খাঁটি দুধের চাইতে কারো কারো নিকটে রাবড়ী ঢের বেশী মিষ্টি লাগে। ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থায় ঘোল কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢের বেশী উপকারী হয়। কিন্তু তাই বলিয়া রাবড়ী বা ঘোল খাঁটি দুধ হয় না। যেমন দুধের' দুগ্ধত্ব বলিয়া একটা বস্তু আছে' যে বস্তুরূপে দুধ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তাহাকে খাঁটি দুধ বলা যায়; সেইরূপ ইংরেজের ইংরেজত্ব বলিয়া একটা বিশেষ বস্তু আছে, এ বস্তুরূপে থাকিলেই ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ হয়। দুধের দুগ্ধত্ব যেমন দুধকে দুনিয়ার আর সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ইংরেজের এই ইংরেজত্ব বস্তু তাহাকে দুনিয়ার আর সকল জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সকল মানুষ এক হিসাবে

সমান বটে; কিন্তু আর এক হিসাবে কোনো মানুষই আর কোনো মানুষের মত নহে। সকল মানুষের দেহ গঠন মোটের উপরে এক; সকলের মোটের উপরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে; সকলেরই মধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে মন বিরাজ করিতেছে, মনের উপরে বুদ্ধি; বুদ্ধির উপরে আত্মা;—সভ্য অসভ্য, আর্য্য অনার্য্য, মানুষমাত্রেই এ সকল সাধারণ মানবধর্ম্ম রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি সকল মানুষ তো সমান নয়। কারণ এই সাধারণ ও সার্ব্বজনীন মানব ধর্ম্মের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা কিছু আছে, যাহাতে প্রত্যেক মানুষকে অপর সকল মানুষ হইতে আলাদা করিয়া রাখিতেছে। এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটী তার চেহারায়, তার চাহনিতে, তার গলার স্বরে, তার পায়ের শব্দে, তার চালচলনে, তার ভাবস্বভাবে, যে ভাবে সে চিন্তা করে, যে রূপে সে সকল জিনিষকে দেখে—এ সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই যে বিশেষত্বটুকু যাহাতে এক মানুষকে আর এক মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখে, ইহাকে সাধারণ মানবধর্ম্মের অন্তর্গত ব্যক্তিধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। যেমন প্রত্যেক ব্যাক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যসমাজের বা মনুজ গোষ্ঠীর কতকগুলি নিজস্ব ধর্ম্ম আছে। আর এই যে নিজস্ব সমাজ ধর্ম্ম বা গোষ্ঠী ধর্ম্ম বা জাতি ধর্ম্ম, ইহারই জন্য এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। বিশাল মনুষ্যত্বের সাধারণ ভূমিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, হিন্দুর হিন্দুত্বকে, ইহুদীর ইহুদীত্বকে, জর্ম্মাণের জর্ম্মাণত্বকে, ইংরেজের ইংরেজত্বকে,—এ সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতিত্ব বা জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানুষ হিসাবে ইহুদী ও হিন্দু, জাপ ও জর্ম্মাণ, রুশ ও চীন, ইতালীয় ও ইংরেজ, এরা সকলেই সমান। সকলেরই মানুষের দেহ, মানুষের মন, মানুষের ভাবস্বভাব রহিয়াছে। অথচ জাতি

হিসাবে ইহাদের সকলেই অপর সকল হইতে ভিন্ন। হিন্দুর চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে, ভাবস্বভাবে, এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহা জগতের আর কোনো জাতির ভিতরে নাই। এই বিশেষত্বটুকু হিন্দুর হিন্দুত্ব। যে সকল চিহ্ন দ্বারা দুনিয়ার অসংখ্য জাতির মাঝখানে আমরা হিন্দুকে বাছাই করিয়া আলাদা করিতে পারি, তাই তার হিন্দুত্ব। সেইরূপ যে সকল চিহ্নের দ্বারা জর্ম্মাণকে জগতের আর দশটা জাতির ভিতরে চিনিয়া লইতে পারা যায়, তাহা তার জর্ম্মাণত্ব। আর যে সকল লক্ষণের দ্বারা ইংরেজকে এইভাবে বিশ্বের মানবসমাজের মাঝখানে চিহ্নিত করিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহা তার ইংরেজত্ব। এই ইংরেজত্ব বস্তু ইংরেজের চেহারায়, তার গঠনে, তার বর্ণে, তার সর্ব্ববিধ সূক্ষ্ম শারীর ধর্ম্মে, তার চালচলনে, তার ভাবস্বভাবে, জীবনের সকল বিভাগে ফুটিয়া রহিয়াছে। যার ভিতরে এই ইংরেজত্ব-বস্তু বেশি লক্ষ্য করিতে পারি, যে ইংরেজ আপনার জাতির এই সকল স্বরূপ লক্ষণেতে অবস্থান করিতেছে, তাহাকে খাঁটি ইংরেজ বলা যায়। আর এই অর্থে ষ্টেড্‌কে আমি অত্যন্ত খাঁটি ইংরেজ বলিতেছি।

ইংরেজত্বের শারীর লক্ষণ

আমাদের দেশের নানা জাতির নানা লোকের ভিতরে কে যে হিন্দু আর কে যে অহিন্দু ইহা যেমন তাহার চেহারাতে অনেক সময় ধরা পড়ে, সেইরূপ বিলাতের নানা জাতির লোকের মধ্যে কে যে ইংরেজ ইহা তার চেহারা দেখিয়া চিনিতে পারা যায়। বিলাতে ইংরেজ আছে, স্কচ্‌ বা স্কট্‌ আছে, আইরিশ আছে, ওয়েল্‌শ্‌ আছে; তাহা ছাড়া জর্ম্মাণ, রুশ, ইতালীয়, ফরাসীস্‌, এ সকল শ্বেতাঙ্গও বিস্তর আছে। আর কিছুদিন সে দেশে বাস করিলে কে কোন্‌ জাতির লোক ইহা তাহাদের

চেহারা দেখিয়া ঠিক করিতে পারা যায়। যেখানে পুরুষানুক্রমে বিবাহ নিবন্ধন নানা জাতির রক্তের বেশি মেশামিশি হইয়া গিয়াছে, সেখানে কে ইংরেজ, কে জার্ম্মাণ, কে আইরিশ, ইহা একেবারে ঠিক করা যায় না বটে, কিন্তু যেখানে এরূপ শোণিত মিশ্রণ হয় নাই, সেখানে খাঁটি ইংরেজ যে কে ইহা তার চেহারাতে ধরা পড়ে। খাঁটি ইংরেজের চেহারা ভারি ভারি ঠেকে। আইরিশের বা ইতালীয়ের চেহারা যেমন কাটা ছাঁটা, ইংরেজের চেহারা সেরূপ নয়। আইরিশ বা ইতালীয়ের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপভাবে আপন আপন উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করে, ইংরেজের যেন সেরূপ করে না। নাক, চোখ, ভ্রূ, কপোল, ললাট, কর্ণ, গ্রীবা,—আইরিশ বা ইতালীয়ের চেহারায় এরা সকলে আপন আপন অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া, সকলে মিলিয়া তার ভিতর দিয়া যেন একটা সুন্দর সঙ্গত মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এরূপ মনে হয়। ইংরেজের চেহারাতে এ ভাবটী লক্ষ্য করা যায় না। আইরিশের বা ইতালীয়ের, প্রাচীন গ্রীশীয়ের বা রোমকের চেহারা দেখিলে মনে হয় যে বিধাতাপুরুষ বুঝি আপনার কারখানায় নিবিষ্ট মনে বসিয়া ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করিতে করিতে, অপূর্ব্ব বাঁটুলি দিয়া এ চেহারাগুলি কুঁদিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজকে গড়িতে যাইয়া কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজের চেহারার উপকরণগুলি বেশ বাছিয়া গুছিয়া যে সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষটা যেন, কোনো দৈব কারণ বশতঃ বিধাতাপুরুষ আঙ্গুল দিয়াই সেগুলিকে ঠাসিয়া, টিপিয়া, ইংরেজের মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, এমন মনে হয়। তার জন্য ইংরেজের গঠনটা কেমন মোটা, ভারি, স্থূল। চীনা বা জাপানীর মতন ইংরেজের নাক খাঁদা নয়, আবার আইরিশ বা ইতালীয়ের মত চাঁছাছোলাও নয়, কিন্তু মোটা। ইংরেজের চক্ষু আকর্ণায়ত নহে, অথচ খুব ছোট নহে; কিন্তু

রংএ ও আকারে কতকটা মার্জ্জার চক্ষুর মত; তার মোহিনীশক্তি অত্যন্ত কম। ইংরেজের কেশ কটা; চিবুক চওড়া; গ্রীবা বঙ্কিম নয়, খাটও নয়, কিন্তু কতকটা মোটা। তার সমুদয় দেহগঠনই অনেকটা স্থূল। এই স্থূলত্বে কোনো বিশেষ কমনীয়তা ফুটিয়া উঠে না, কেবল সতেজ রক্তমাংশের একটা জীবন্ত প্রভাবই যেন অনুভূত হইয়া থাকে। এই রক্তমাংশের প্রভাবের একটা বিশেষ শব্দ ইংরেজিতে আছে, আমাদের ভাষায় তাহা আছে বলিয়া জানি না। ইংরেজিতে এ বস্তুকে এনিম্যালিজ্‌ম্‌ (Animalism) বলে। আর খাঁটি ইংরেজ যত কেন উন্নত চরিত্রের হউন না, এই এনিম্যালিজ্‌ম্‌ বস্তুটী তাঁর চেহারাতে সর্ব্বদা স্বল্প বিস্তর ফুটিয়া রহে। বুলডগ (Bulldog) নামে যে এক জাতীয় বিলাতী কুকুর আছে, সারমেয় সমাজে তার চেহারা যে ছাঁচের, কুকুর জাতির ভিতরে সে চেহারার যে বিশেষত্ব আছে, মনুষ্য সমাজে ইংরেজের চেহারাও কতকটা সেই ছাঁচের।

ইংরেজত্বের মানস লক্ষণ

ইংরেজের চেহারা স্থূল কিন্তু শক্ত, মোটা কিন্তু অনমনীয়, কোন অঙ্গ তার অপরিস্ফুট নয়, অথচ কোন অঙ্গই যেন জড়ত্বের ও মনুষ্যেতর জীবত্বের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। যেমন ইংরেজের চেহারায় বুল্ ডগ্‌কে মনে করাইয়া দেয়, তেমনি তার প্রকৃতিও অনেকটা এই বুলডগেরই মত। বুল্‌ডগ্‌ একবার কোনো শিকারের পশ্চাতে ছুটিলে সে শিকারকে কখনো ছাড়িয়া আসে না। একবার কোনো শিকারকে ধরিলে, প্রাণ যায় যাক্‌ তবুও তার দাঁতের কবাট আর খোলে না। ইংরেজও সেইরূপ যে লক্ষ্যকে একবার সন্ধান করে, তাহাকে কখনো লাভ না করিয়া ছাড়ে না। যাহা একবার ধরে, প্রাণান্ত হইলেও তাহাকে আর পরিত্যাগ করে না। সহজে সে কোনো

বিষয়ে কান দেয় না। হুজুগে পড়িয়া সে আত্মহারা হয় না। কোনো বস্তুকে বুঝিতে তার সময় লাগে। কোনো লক্ষ্যকে সন্ধান করিবার পূর্ব্বে সে অনেক ভেবে চিন্তে করে। তার বৈশ্যপ্রকৃতি ক্ষতি লাভের খতিয়ান না করিয়া কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু একবার যদি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে, একবার যদি কোন লক্ষ্যকে সন্ধান করে, একবার যদি কোনো ব্যাপারে হাত দেয়, তবে তার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টায় ইংরেজ আর অগ্রপশ্চাৎ, ভালমন্দ বা ক্ষতিলাভ, কোন কিছুর গণনা করে না। ইংরেজকে দেখিলে, তার চেহারার ভিতরে একটা পশু-ভাবের প্রভাব লক্ষ্য হয়। তার শারীর প্রকৃতিকে অনেকটা তাসমিক বলিয়া মনে হয়, সত্য; কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে নিদ্রালস্য প্রভৃতি তমোধর্ম্মের লেশ মাত্র আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজ ব্যবসাদার, দোকান-পশারীর জাত, অথচ দোকান-পশারীর স্বভাবসুলভ কৃপণতা তাহাতে নাই। ইংরেজের বুদ্ধি অনেকটা স্থূল, সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধরিবার শক্তি তার কম, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অথচ স্থূলবুদ্ধি লোকের মধ্যে যে এক প্রকারের মানসিক জড়তা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরেজের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। কথাটা আপাত স্ববিরোধী হইলেও নিরতিশয় সত্য যে জগতের অপর জাতির মধ্যে সচরাচর যাহা নিতান্ত দোষের বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই ইংরেজের মধ্যে ইংরেজ প্রকৃতির বিশেষত্ব নিবন্ধন, তার গুণগরিমার মূল কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

ষ্টেডের শারীর লক্ষণ ও মনের প্রকৃতি

ইংরেজ প্রকৃতির এই সহজ ও বিশেষ ধর্ম্মগুলি ষ্টেডের মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সকল প্রসিদ্ধ ইংরেজের চেহারা দেখিয়াছি, তার কোথাও ইংরেজের ইংরেজত্বটি এমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। গ্ল্যাডষ্টোন্ কি মর্লে, টেনিসন্

কি মরিস্, হ্যারিসন কি স্পেন্সার, এঁদের সকলের চেহারাতে এমন কিছু না কিছু চাঁছাছোলার, কাটাকুঁদার ভাব ছিল যে ভাব খাঁটি ইংরেজের চেহারায় নাই। খাঁটি ইংরেজের চেহারা ঢালাই জিনিষ, খোদাই জিনিষ নহে। ষ্টেডের চেহারাও ঢালাই ছিল, খোদাই ছিল না। তাহা অনেকটা সাদাসিধে, অনেকটা মোটাশোটা, অনেকটা স্থূল ছিল। ষ্টেড্‌কে দেখিয়া মনে হইত, বিধাতাপুরুষ যে বিশেষ ছাঁচে প্রথমে ইংরেজকে গড়িয়াছিলেন বহুদিন পরে বুঝি সেই ছাঁচটাকে ধুইয়া মুছিয়া, ঘষিয়া মাজিয়া, আবার যেন তাহাতেই আমাদের এ কালে ষ্টেড্‌কে ঢালাই করিয়া পাঠাইয়াছেন। ষ্টেডের মাথাটা বড় ছিল। আর সেই বড় ও সুগোল মস্তকের ঘননিবিড় কেশরাশি তাঁর ভিতরকার ভাবপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করিত। অতিশয় ভাবপ্রবণ লোকে একটু লঘুচিত্ত, একটু চঞ্চল, একটু নিষ্ঠাহীন হইয়া থাকে। কি আইরিশ্, কি স্পেনীয়, কি ফরাসীস্, কি ইতালীয়,—য়ুরোপের ভাবপ্রবণ লোকেরা সকলে স্বল্পবিস্তর লঘুচিত্ত, চঞ্চল ও নিষ্ঠাহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরেজের চরিত্রে এ লঘুচিত্ততা, এ চাঞ্চল্য, এ নিষ্ঠাহীনতা নাই বলিলে হয়। ষ্টেডের আন্তরিক ভাবপ্রবণতার মধ্যেও এরূপ লঘু-চিত্ততা, চাঞ্চল্য বা নিষ্ঠাহীনতা ছিল না। তাঁর সুগঠিত মস্তকের নিবিড় কেশরাশি যেমন তাঁর ভাবপ্রবণতার পরিচয় দান করিত, তেমনি আবার তাঁর প্রশস্ত ললাট, উন্নত কপোল, অপেক্ষাকৃত স্থূল অধরোষ্ঠ ও আয়ত চিবুকের ভিতর দিয়া তাঁর চরিত্রের স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার আভা ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁর চোখ দু'টী ছোট ছিল। কিন্তু সেই ছোট গোলকের তীব্র দৃষ্টির ভিতর দিয়া লোকচরিত্র বুঝিবার একটা অসাধারণ শক্তি এবং আপনার স্বত্বস্বার্থ রক্ষা করিবার উপযোগী একটা বণিক-স্বভাব-সুলভ চতুরতাও প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ষ্টেডের মুখের দিকে চাহিলে মনে হইত, এ লোককে ক্ষেপান

যায়, কিন্তু ঠকান যায় না। এ ব্যক্তি ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া, কোন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সর্ব্বনাশকে অকুতোভয়ে আলিঙ্গন করিতে পারে, কিন্তু ভাল করিয়া না বুঝিয়া, আপনি কোন বিষয়ের সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ ও প্রমাণিত না করিয়া, অন্ধ বিশ্বাসের প্রেরণায় বা কোন হুজুগের টানে, গোলে হরিবোল দিয়া, অন্ধকারে এক পা-ও চলিতে পারে না। ষ্টেডের চেহারার ভিতর দিয়া এ সকল যেন ফুটিয়া বাহির হইত।

ষ্টেডের বাল্যশিক্ষা

ষ্টেড্ সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়া অতি সাধারণ ভাবে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমরা আজিকালি উচ্চশিক্ষা বলিয়া জানি, সে শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। ষ্টেড্ কোন বড় স্কুলে যান নাই। বিলাতে আমাদের দেশের মত বর্ণভেদ নাই, কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে। বর্ণভেদে সামাজিক পদমর্য্যাদাকে একান্ত ভাবে ব্যক্তিবিশেষের জন্ম ও কুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রেণীভেদে সামাজিক পদমর্য্যাদাকে অনেক পরিমাণে ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। বর্ণভেদের উপরে যে সমাজ গঠিত, সেখানে ধনের মূল্য কখন অতিমাত্রায় বাড়িয়া যাইতে পারে না। সেখানে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অন্য দিকে শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজ গড়িয়া উঠে, সেখানে ধনের মূল্যটা আপনা হইতে চড়িয়া যায়। সেখানে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে জীবনের সকল পথে একটা দুরতিক্রমণীয় ব্যবধানের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত সমাজে, যে বড় কুলে জন্মাইল, তার ধন থাক্ বা না থাক্, আপনার কুলোচিত বিদ্যা ও জ্ঞান তাহাকে উপার্জ্জন করিতে হয়। সমাজও সেখানে আত্মরক্ষার জন্য আপনা হইতে এই বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রেণীভেদ প্রতিষ্ঠিত সমাজে টাকা

দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। এই জন্য শ্রেণীভেদের উপরে যে সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে বিদ্যালাভ ধনীদের সাধ্যায়ত্ত, দরিদ্রের পক্ষে সহজ নহে। বিলাতে ইটন (Eton), হ্যারো (Harrow), উইন্‌চেষ্টার (Wincheste:), রাগ্‌বী (Rugby) প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্কুল আছে। দেশের বড়লোকের বালকেরা এই সকল স্কুলে যাইতে পারে। আভিজাত্যের দাবী যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে এ সকল স্কুলে যাওয়া অসম্ভব। এ সকল স্কুলের বালকেরাই অক্সফোর্ড (Oxford) ও ক্যাম্ব্রিজ (Cambringe) এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। অক্সফোর্ড (Oxford) ও ক্যাম্ব্রিজ (Cambridge) এই দুই পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলের প্রতি উন্মুক্ত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এখানে বিদ্যালাভ করা এতই ব্যয়সাধ্য যে দেশের সাধারণ গরিব লোকে সে ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। তার উপরে এই দুইটী বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনের মধ্যে এমন একটা আভিজাত্যের অভিমান জাগিয়া আছে যে, সমাজের অপর শ্রেণীর বালকেরা সেখানে যাইয়া অনেক সময় "হংসমধ্যে বকো যথা"র ন্যায় বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ষ্টেড্‌ গরিব গৃহস্থের সন্তান। বিলাতী সমাজের অভিজাত-শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোন প্রকারের সম্বন্ধের গন্ধ মাত্র ছিল না। সুতরাং কোন প্রসিদ্ধ স্কুলে বা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অতি অল্প বয়সে এক আফিসে ছোক্‌রার বা এরেণ্ড বয়ের (Errand-Boy) কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ষ্টেড্‌কে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে হয়।

কলেজের শিক্ষা ও কাজকর্ম্মের শিক্ষা

বিধাতার বিশ্বে যেখানে কোন বিশেষ মন্দ জাগিয়া উঠে, সেখানে

সেই মন্দের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধায়ক ভালটাও আপনা হইতে গড়িয়া উঠে। মানুষের প্রকৃতি কখন চিরকাল বা দীর্ঘকাল কোন মন্দকে আশ্রয় করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব, সমাজের পক্ষে ইহা অসাধ্য। যাহা অপূর্ণ তাহাই মন্দ। আর মানব-প্রকৃতি পূর্ণতার বীজ বুকে ধরিয়া ঋজুকুটিলভাবে সেই পূর্ণতার দিকে ক্রমে ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তি ইহা করিতেছে, সমাজ এই পথেই চলিতেছে। আর তার জন্য কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, মানুষের সকল প্রকারের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার ভিতরে ভালোর মধ্যে মন্দ ও মন্দের মধ্যে ভালো মিশিয়া রহে। এই জন্য রজতপ্রধান বিলাতী সমাজে গরিব লোকের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে কিম্বা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যালাভ করা যেমন কঠিন, অন্যদিকে সেইরূপ এ সকল সুযোগ না পাওয়া যত লোক সেখানে কেবল আপনার অনুশীলন ও অধ্যবসায়বলে অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাভ করিয়া সমাজে অসাধারণ সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন, অন্য কোন সমাজে তাহা সম্ভব হয় না। কি ব্যবসা-বাণিজ্যে কি রাষ্ট্রীয় কার্য্যে কিম্বা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে বিলাতে যাঁহারা সমাজে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন, তাঁহাদের সকলে বা অনেকে যে অক্সফোর্ড্ বা ক্যাম্ব্রিজের ছাত্র, এমন নহে। ইংরেজের বিশাল বাণিজ্য যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহাদের একজনেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজ জাতির ক্ষাত্রবীর্য্য যে সকল বীরকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ক'জনের সঙ্গেই বা অক্সফোর্ড্ বা ক্যাম্ব্রিজের কোন সম্পর্ক ছিল? বারুণীর অঙ্কে বর্দ্ধিত ইংরেজের নৌ-বিলাস হইতে ইংলণ্ডের বিশ্ববিজয়িনী নৌশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজের শিক্ষা হইতে হয় নাই। ফলতঃ সকলে অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজে যাইতে পারে না

বলিয়া ইংরেজ সমাজের এত লোক বাল্যে কোন উচ্চ শিক্ষা না পাইয়াও শুদ্ধ আপনাদের অদম্য অধ্যবসায়বলে পরজীবনে সমাজের শ্রেষ্ঠজনের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। এই অদম্য অধ্যবসায় ইংরেজ চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ।

ষ্টেডের অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব

এই অধ্যবসায় গুণে ষ্টেড্ও অতি সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়া, শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা লাভের কোনো সুযোগ না পাইয়াও, পরজীবনে কেবল আপনার দেশে নহে, কিন্তু সমগ্র সভ্যসমাজে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন যে সামান্য হরকরার কাজে নিযুক্ত হইয়া লণ্ডনের রাজপথে চিঠি হাতে করিয়া ছুটোছুটি করিত, পরে এমন এক দিন আসিল, যখন রুশিয়ার জার ও জার্ম্মাণীর ক্যায়সার, তুরস্কের সুলতান ও ইংরেজ সম্রাট, নিয়মতন্ত্রাধীন রাজমন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রাধীন প্রেসিডেণ্ট, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-প্রচারক, তাঁহার পরামর্শপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অথচ ষ্টেড্ কখনো সাক্ষাৎভাবে কোন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মভার গ্রহণ করেন নাই। ব্রিটিশ পার্ল্যামেণ্টে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। তাঁহার অপেক্ষা অনেক নীচুদরের ইংরেজও পার্ল্যামেণ্টে যাইয়া ক্রমে মন্ত্রীদলে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে ষ্টেড্ও তাহা পারিতেন। কিন্তু এ চেষ্টা তিনি কখনো করেন নাই। একবার কেবল তিনদিনের জন্য পার্ল্যামেণ্টে যাইবার তাঁর সাধ হইয়াছিল,—আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তখন আইরিশ্ লোকনায়ক পার্ণেল জীবিত ছিলেন। সে সময়ে কি একটা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অহিতাচারের তীব্র প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয়। ষ্টেড্ পার্ণেলকে একটা আইরিশ্ কনষ্টিটুয়েন্সী (Constituency) জোগাড় করিয়া তিন চার দিনের জন্য

তাঁহাকে পার্লামেন্টের সভ্য করিয়া দিতে বলেন। পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া এই অহিতাচারের প্রতিবাদ করিয়া একটী মাত্র বক্তৃতা দিয়াই তিনি তাঁর পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া যাঁর স্থান তাঁহাকে দিতে রাজি হন। যাহা হউক, ষ্টেডের এই ক্ষণিক সাধও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু পার্লামেন্টের সভ্য না হইয়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বিকাশ সাধনে ষ্টেড্ যতটা সাহায্য করিয়াছেন, গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি অতি অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যতীত আর কেহ ততটা সাহায্য করিয়াছেন কি না, সন্দেহের কথা।

আর ষ্টেডের এই অসাধারণ কৃতিত্বের পশ্চাতে তাঁর সাচ্চা ইংরেজ-প্রকৃতিটী দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেডের বুদ্ধি যে নিরতিশয় সূক্ষ্ম ছিল, তাহা নহে। ইংরেজের স্বাভাবিক বুদ্ধি একটু মোটা। তাহা ভারে কাটে কিন্তু ধারে কাটে না। কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্বে বা জটিল বিষয়ে ইংরেজের বুদ্ধি সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। কোনো জটিল সমস্যার জটিলতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, একটা সম্যক্ দর্শন ফুটিয়া উঠে। ইংরেজ বুদ্ধির এ সম্যক্ দৃষ্টি নাই। যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ব্যবসায়ীর লাভালাভ জানিবার জন্য অত্যাবশ্যক, ততটুকু দূরদর্শিতা ইংরেজের বুদ্ধির আছে। কিন্তু যে সম্যক্দৃষ্টি তত্ত্বদর্শীর লক্ষণ, ইংরেজের সে সম্যক্দৃষ্টি নাই। আর সেরূপ সম্যক্দৃষ্টি নাই বলিয়া ইংরেজের একটা অসাধারণ 'গোঁ' আছে। এই গোঁয়ের জোরে ইংরেজ দুনিয়া জয় করিয়াছে। আর এই গোঁয়ের জোরে ষ্টেডও অসাধারণ বিদ্যার বল অথবা বিপুল ধনের বল কিম্বা আভিজাত্যের সুবিধা ব্যতীতও আজীবন ইংরেজসমাজে রাজা ও প্রজা, ইতর ও ভদ্র, সকলের উপরে এতটা আধিপত্য ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম প্রতিষ্ঠা

ষ্টেডের প্রথম প্রতিষ্ঠা "পেল্ মেল্ গেজেট" (Pall Mall Gazette)

নামক পত্রিকায়। সে আজ প্রায় আটাশ বৎসরের কথা। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের পাঠকদিগের নিকটে ষ্টেড্ তার পূর্ব্ব হইতে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু যে দিন "Maiden Tribute of Modern Babylon" নামক প্রবন্ধাবলী পেল্ মেল্ গেজেটে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল, সে দিন সমগ্র সভ্যজগতের চক্ষু ষ্টেডের উপরে যাইয়া পড়িল। সেদিন ইংরেজ বুঝিল যে বহুদিন পরে একজন মানুষের মত মানুষ দেশে জন্মিয়াছে। সেদিন দুনিয়া দেখিল যে ইংরেজের বিপুল ধনরাশি, তাহার প্রচণ্ড ভোগবিলাস, তাহার সখ ও সৌখিনতা এ সকলের পশ্চাতেও একটা সাচ্চা মনুষ্যত্ব-বস্তু জাগিয়া আছে। সে দিন ইংরেজ-সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল। লণ্ডন সহরে সে সময়ে একদল বড়লোক গরিব পিতামাতাকে টাকা দিয়া বশ করিয়া তাহাদের উদ্ভিন্নযৌবনা অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাগণের সর্ব্বনাশ করিতেছিল। এই পাপে ইংরেজ অভিজাতসমাজ নিরয়গামী হইতেছিল। প্রাচীন বেবিলনে, আমাদের দেশের কোনো কোনো তান্ত্রিক সাধনের ন্যায়, ধর্ম্মের নামে কুমারীগণের সতীত্ব নাশ করা হইত, এরূপ কিম্বদন্তী আছে। এই কিম্বদন্তী স্মরণ করিয়া ষ্টেড্ লণ্ডন সহরকে মডার্ণ বেবিলন (Modern Babylon) নামে অভিহিত করেন। আর বেবিলনের পুরাতন গর্হিতাচার মনে করিয়া কুমারী-বলি বা Maiden Tribute বলিয়া লণ্ডনের ধনী লোকদিগের এই আধুনিক পশুবৃত্তির ব্যাখ্যান করেন। বিলাতের অতিবড় সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এই পাপে লিপ্ত ছিল। মাতৃরূপিণী রমণীর শ্রেষ্ঠতম বস্তু যে এরূপভাবে বেচা কেনা হয়, ষ্টেড্ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। এ দুরাচারের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করিবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কেবল লোকের মুখের কথার উপরে নির্ভর করিয়া সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে অত বড় অভিযোগ আনা সম্ভব বা সঙ্গত নহে ভাবিয়া, তিনি

স্বয়ং ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। আপনি একজন লম্পট সাজিয়া, যাহারা এই গর্হিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তেমন লোকের দ্বারা একটী উদ্ভিন্নযৌবনা বালিকার মাতাকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া, তার কন্যাকে সংগ্রহ করিলেন। বিলাতী আইনে সে সময়ে ষোড়শ বর্ষই বালিকাগণের নিম্নতম "সম্মতির" বয়স বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। এই বালিকার বয়স যে ষোড়শ বর্ষের ন্যূন ইহা সত্ত সত্ত ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইলেন। যখন এতটা প্রমাণ স্বয়ং সংগ্রহ করিলেন, ব্যাপারটা যে সত্য সে বিষয়ে যখন আর তিলপরিমাণ সন্দেহের অবসর রহিল না, তখন ইহার কথা সাধারণে প্রচার করিয়া Maiden Tribute শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পত্রস্থ করিলেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশ হইবা মাত্র, চারিদিকে তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। ধনী দল আপনাদের কলঙ্ক রটনায় ক্রোধে ভয়ে লোকলজ্জায় অস্থির হইয়া পড়িল। ইংরেজ জনসাধারণে দারিদ্র্যের অবমাননার কথা পড়িয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। সভ্য-জগতের লোকে ইংরেজের নামে ধিক্কার দিতে লাগিল। Maiden Tribute লেখার জন্য ষ্টেডকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করা অসম্ভব দেখিয়া, তাঁর শত্রুগণ ষ্টেড আপনি যে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীকে ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইয়া আপনার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে ষ্টেড্ অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে নালিশ রজু করাইলেন। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছেন বলিয়া ষ্টেড রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া তাঁর কারাদণ্ড হইল। কিন্তু এ জন্য ষ্টেডের দুঃখ হইল না। এ দণ্ড তাঁর নিন্দার হেতু না হইয়া শ্লাঘার কারণ হইল। কারাবাস তাঁর অপমানের বিষয় না হইয়া গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিল। আমরণ পর্য্যন্ত ষ্টেড যে তারিখে তাঁর কারাদণ্ড হইয়াছিল, প্রতি বৎসর সেই দিন পুরাতন কয়েদীর পোষাক পরিধান করিয়া,

সেই ত্যাগযজ্ঞের সাম্বৎসরিক উৎসব করিতেন। ষ্টেডের জেল হইল বটে, কিন্তু যে গুপ্ত অত্যাচারের কথা লোকমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করিয়া তিনি এ দণ্ডভোগ করেন, সে অহিতাচারেরও প্রতিবিধান হইল। Maiden Tribute শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বিলাতের প্রাচীন দণ্ডবিধিতে অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা যুবতীগণের সহবাসকে দণ্ডনীয় করিয়া নূতন বিধান সন্নিবিষ্ট হইল। এই বিধান অনুসারে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের "সম্মতির" বয়স অষ্টাদশবর্ষ নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ক্রিমিন্যাল এমেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট (Criminal Amendment Act) ইংরেজের সমাজ-জীবনের ইতিহাসে ষ্টেডের অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া চিরদিন ঘোষিত হইবে।

বিলাতী সংবাদপত্র-সম্পাদনে ষ্টেডের বিশেষত্ব

সাময়িক পত্রের লেখক ও সম্পাদক বলিয়া ষ্টেড্ আধুনিক সভ্য-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে সাময়িক সংবাদপত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু সাময়িক পত্রের প্রভাব যত, এই সকল পত্রের লেখকদিগের প্রতিষ্ঠা তার শতাংশের এক অংশও হয় না। ফলতঃ এ সকল পত্রে কে লেখে বা না লেখে, সাধারণ লোকে তার খবর রাখে না। বিলাতী সাময়িক পত্রসকল দল বিশেষের মুখপত্র হইয়া থাকে। যে পত্রিকা যে দলের মুখপত্র, তাহাতে সেই দলের মত ও নীতির পোষকতা করা হয়। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া লেখকগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। লেখকেরা পয়সা খাইয়া লেখেন। যাহাদের বেতনভোগী হইয়া ইহারা প্রবন্ধাদি রচনা করেন, তাহাদের মতামতই ইহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হয়। নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কোনো কিছু লিখিবার অধিকার ইহাদের প্রায় থাকে না। কখনো কখনো নিজেদের যাহা

মত নয়, এমন বিষয়ও ইহাদিগকে লিখিতে হয়। এরূপ ব্যবসাদারী সাহিত্যচর্চ্চায় ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা হইলেও মনোবৃত্তির স্ফুরণ কিম্বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। বিলাতের ধনী লোকেরা এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বহুকাল ধরিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকগণের মনুষ্যত্বকে এইরূপভাবে চাপিয়া রাখিয়া ও পিষিয়া মারিতেছিলেন। ষ্টেড্ই সর্ব্বপ্রথমে এই নিষ্ঠুর দাসত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকের ও সাময়িক-পত্রের লেখকগণের আত্মসম্মান-বোধকে জাগাইয়া তোলেন। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বেনামী লেখাই বিলাতী সংবাদপত্রের সাধারণ রীতি ছিল। ষ্টেডই সর্ব্বপ্রথমে নিজের নাম দিয়া সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। আজিকালি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের লেখকগণ নিজেদের নাম দিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বকার বেনামী লেখাতে সংবাদপত্র বিশেষের প্রতিষ্ঠা হইত, দলবিশেষের প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বাড়িয়া যাইত; জনগণের চিন্তা ও চরিত্র কিম্বা রাষ্ট্রের কর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে লোকমত সংগ্রহকারী সাময়িকপত্রের লেখকগণের ব্যক্তিত্বের বা বিদ্যাবুদ্ধির কোনো প্রকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত না। ষ্টেড এ সকলকে বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। সাময়িক পত্রের লেখকগণ যে রাষ্ট্রীয় জীবনগঠনে কতটা সহায়তা করেন, প্রতিভাশালী সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদগৌরব ও শক্তিসাধ্য যে কোনো রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রমন্ত্রী অপেক্ষা কম নহে, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে অনেক বেশী; লোকে পূর্ব্বে ইহা কখনো অনুভব করে নাই। ষ্টেডকে দেখিয়া তারা এখন ইহা বুঝিয়াছে। ষ্টেড্ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও সাময়িক পত্রের লেখক ছিলেন। কিন্তু কি স্বরাষ্ট্রের কিম্বা পররাষ্ট্রের বিশেষ বিশেষ নীতি নির্দ্ধারণে তিনি যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন, অনেক রাষ্ট্রমন্ত্রী তাহা করিতে পারেন নাই।

ইংরেজের নৌ-নীতি আজ যে রীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, তাহা বহুল পরিমাণে ষ্টেডের উদ্ভাবিত। জর্ম্মণী প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রশক্তির নৌবলের তুলনায় ইংরেজের নৌশক্তিকে কি পরিমাণে বাড়াইতে হইবে, তাহার মূলমন্ত্রটী ষ্টেডের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়। ষ্টেডই প্রথমে এ কথা বলিয়াছিলেন যে, অপরে যখন একখানা যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিবে, ইংলণ্ডকে তখন দু'খানা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আজ উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলের রাষ্ট্রনীতিকেরা এক বাক্যে এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। আজিকালি য়ুরোপের সর্ব্বত্র শালিশী দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে, ষ্টেড্ তাহারও সূত্রপাত করেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে হেগ্ (Hague) নগরীতে সভ্যজগতের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি হইয়া পরস্পরের বিবাদ যাহাতে আপোষে মিটিতে পারে, তাহার বিচার আলোচনা করিয়াছিলেন। ষ্টেড্ সেই শান্তি সমিতি বা 'Peace Conference' এর একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও অধ্যবসায় ব্যতীত এই অনুষ্ঠান যে সম্ভব হইত না, ইহা সকলে এখন একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ষ্টেডের ধনবল ছিল না। ষ্টেড্ কোনো রাষ্ট্রনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না। তাঁর লোকবলও ছিল না। তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি কিম্বা অলোকসামান্য প্রতিভাও ছিল না। তাঁর ছিল কেবল অদমনীয় অধ্যবসায়, অকপট সত্যানুরাগ, অসাধারণ আত্মনির্ভরতা এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম ও লোকহিতৈষা। ষ্টেড বালকের ন্যায় সরল ছিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমলহৃদয় ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন, সিংহের ন্যায় সাহসী ছিলেন ও পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। আর তাঁহার মধ্যে এ সকল গুণের সমাবেশ ছিল বলিয়াই, সামান্য সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক হইয়াও তিনি সাময়িক ইতিহাসে এরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সংবাদপত্র-পরিচালকগণ দুই পথ ধরিয়া প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। এক পথে যাইয়া, সর্ব্বদা লোকমতের অনুসরণ করিয়া, জনসাধারণে যখন যে ভাবে ক্ষেপিয়া উঠে সেই ভাবেতে ইন্ধন জোগাইয়া তাঁহারা সহজে লোকের অনুরাগভাজন হইতে পারেন। আর এক পথে যাইয়া, জনসাধারণের কি ভাল লাগিবে সে দিকে দৃক্পাত না করিয়া, কিসে তাহাদের ভাল হইবে, তার অনুধ্যান করিয়া, তাহাদিগকে প্রেয়ের পথে নয় কিন্তু শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। প্রথম পথের পথিক লোকমতের অনুসরণ করিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় জনসাধারণের সেবা করেন। এ পথ সহজ। এই পথে অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে সংবাদপত্র-পরিচালক আপনার পশার বৃদ্ধি করিতে পারেন। এ পথ ব্যবসাদারের পথ। বিলাতের প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্রের ও সাময়িকপত্রের প্রায় সকলগুলি এই পথের পথিক। লোকমতের হাওয়া যখন যে বিষয়ে যে দিকে প্রবলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করে, তখন ইহারা সেই দিকে আপনাদের লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। দেশের প্রবল রাষ্ট্রীয়-দলের প্রত্যেকের দু' এক খানা মুখপত্র আছে। এই সকল সংবাদপত্র নিজ নিজ দলের নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া চলে। এক সময়ে বিলাতে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল, লিবারেল ও কন্সারভেটিভ (Liberal ও Conservative) এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কোনোটার একান্ত অনুগত নয়, এমন সংবাদপত্র ছিল না। তখন যারা সংবাদপত্র কিনিতেন ও পড়িতেন, তারা সকলেই হয় কন্সারভেটিভ না হয় লিবারেল এই দুই দলের এক দল ভুক্ত হইতেন। আর এই দুই দলের মধ্যে এতটা রেশারেশি ছিল যে একদলের লোকে অপর দলের পোষক সংবাদপত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। সাময়িক পত্রের পাঠক সংখ্যাও তখন অল্প ছিল। ক্রমে এ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

সাময়িক পত্রের পাঠকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক গুণে বেশী হইয়াছে। আগেকার দলাদলির ভাবটাও ক্রমে কমিয়াছে। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় দলভুক্ত নহে, সাময়িক পত্রের এরূপ অনেক পাঠক এখন জুটিয়াছে। এ সকল লোকেই পার্লামেণ্টে সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিদলের ভাগ্যবিধাতা হইয়া থাকে। যখন যে দলের দিকে ইহারা ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন সেই দলের জিত হয়। আর আজিকালি বিলাতে এই সকল লোকই ব্যবসাদারী সাময়িক পত্র সকলের প্রভু হইয়া বসিয়াছে। সুচতুর ব্যবসায়ী যেমন বাজারের মতি গতি লক্ষ্য করিয়া আপনার পণ্য সংগ্রহ করে ও দোকানপাট সাজায়, গ্রাহকের মন জোগাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করা ছাড়া আর কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যেমন তার থাকে না, সেইরূপ এই সকল সংবাদপত্র-পরিচালকও লোকমত কোন্ দিকে চলিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং সেই মতের পোষকতা করিয়া আপনাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কোনো বিষয়ের সত্যাসত্য, ভালমন্দ বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তাঁহাদের কর্ত্তব্য সীমার বাহিরে পড়িয়া রহে। এই সকল সংবাদপত্র-পরিচালক জনমণ্ডলীর আসন্ন পরিচালকরূপে তাহাদের মর্জ্জি জোগাইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন; লোকের ইষ্টানিষ্ট ও দেশের ভালমন্দের প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই। বিলাতের অধিকাংশ সাময়িক পত্র এখন এই পথ ধরিয়া চলিতেছে। ডে'লি মে'ল (Daily Mail) জাতীয় সংবাদপত্র এই পথ ধরিয়া চলিয়াই দেশটা লুটিয়া খাইতেছে। কিন্তু ইহাই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-পরিচালনার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নহে। ভালমন্দ বিচার না করিয়া লোকমতের অনুসরণ করা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ব্যবসায় বা কর্ত্তব্য নহে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক জনমণ্ডলীর পরিচারক হইবেন না কিন্তু পরিচালক হইবেন; অনুগত ভৃত্য হইবেন না, কিন্তু তাহাদের শক্তিশালী গুরু হইয়া,

তাহাদিগকে প্রেয়ের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইবেন। ইহাই সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সত্য লক্ষ্য। আর আধুনিক বিলাতী সমাজে যে অত্যল্পসংখ্যক সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও লেখক এই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ষ্টেড তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। যে কালে ষ্টেড এই আদর্শ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করেন, সে কালে বিলাতী সংবাদপত্র-সম্পাদক ও লেখক-বর্গের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা বলিয়া কোনো বস্তু ছিল না। যে পেল্ মেল্ গেজেটকে আশ্রয় করিয়া ষ্টেড বিলাতের সাময়িক সাহিত্যে অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই পেল্ মেল্ গেজেটের সঙ্গেও বেশীদিন একসঙ্গে কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ষ্টেড্ "পেল্ মেল্" পরিত্যাগ করিলেন। যে আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া তাঁহাকে পেল্ মেল্ ছাড়িয়া দিতে হয়, অন্য কোনো সংবাদপত্রের বেতনভোগী সম্পাদক বা লেখকরূপে সেই আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না। আপনার জীবনের লক্ষ্য সাধনের জন্য ষ্টেডকে তখন আপনার স্বত্বাধীনে একখানি সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হয়। এইরূপেই তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত রিভিউ অব্ রিভিউজের (Review of Reviews) উৎপত্তি হয়। আপনি এই পত্রের স্বত্বাধিকারী ও আপনি ইহার সম্পাদক ও পরিচালক হইয়া ষ্টেড বিগত বাইশ বৎসর কাল আধুনিক সভ্যসমাজে আপনার পবিত্র লোকশিক্ষা ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

"রিভিউ অব্ রিভিয়ুজ্"

যে অকপটে যে আদর্শের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, বিধাতাপুরুষ স্বয়ং তাহাকে সেই আদর্শ লাভের উপযোগী বিচারবুদ্ধি ও শক্তি সাধ্য দান করিয়া থাকেন। ষ্টেডের যে অসাধারণ বুদ্ধি কিম্বা অলোকসামান্য

দূরদৃষ্টি ছিল, এমন বলা যায় না। কতটা পরিমাণে যে রিভিউ অব রিভিউজ্ (Review of Reviews) তাঁহার লোকশিক্ষা ব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিবে, প্রথম হইতে যে তিনি এটী বুঝিয়াছিলেন এমনও বোধহয় না। আজিকালিকার দিনে লোকে নিজ নিজ বিষয়-কর্ম্ম লইয়া এতই ব্যাপৃত হইয়া পড়ে যে বড় বড় মাসিক পত্রে যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা হয়, সে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িবার সময় ও শক্তি তাহাদের থাকে না বলিলে হয়। অথচ দুনিয়ার চিন্তাস্রোত কোন্ ভাবে কোন্ দিকে চলিতেছে এই সকল মাসিক পত্র না পড়িলে তাহার সন্ধান রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মব্যস্ত জনগণের হস্তে অর্পণ করিবার জন্যই রিভিউ অব রিভিউজের জন্ম হয়। ইহা অপেক্ষা কোনো উচ্চতর লক্ষ্য যে ষ্টেড তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এমন মনে হয় না। আর প্রত্যক্ষ করেন নাই বলিয়া তাঁহার এই অনুষ্ঠানের অন্তরালে আমরা এখন বিধাতাপুরুষের হস্তই দেখিতেছি। ষ্টেড্ নিজের একখানা দৈনিক সংবাদপত্র না হউক, অন্ততঃ উচ্চ অঙ্গের সাপ্তাহিক বা মাসিক ইংরেজী পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। কেন যে তিনি সে পথে যান নাই জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে তিনি রিভিউ অব রিভিউজের সাহায্যে সমগ্র সভ্যজগতের চিন্তা ও কর্ম্মের উপরে যতটা প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক ইংরেজী পত্রিকার সাহায্যে তাহা লাভ করিতে পারিতেন না। রিভিউ অব রিভিউজ ইংরেজীতে লেখা হইত সত্য, আর লণ্ডনে তাহা ছাপা হইত। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইহাকে কেবল ইংরেজের কাগজ বলা যাইতে পারিত না। য়ুরোপের সর্ব্বত্র যে সকল কর্ম্মী ও মনীষীগণের হস্তে আধুনিক জগতের ভাগ্যসূত্র রহিয়াছে, রিভিউ অব রিভিউজ তাঁহাদের সকলের শ্রদ্ধার ও আদরের বস্তু ছিল। রাজপ্রাসাদে রাজা, মন্ত্রীভবনে রাজমন্ত্রীগণ,

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, সেনাশিবিরে সেনানায়ক, সংবাদপত্রের আফিসে সম্পাদক, ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজক, নাট্যশালায় নটনায়ক, আধুনিক সভ্যজগতের সর্ব্বত্র যাঁহারা জনগণের চিন্তাস্রোত ও কর্ম্মস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের সঙ্গে রিভিউ অব্ রিভিউজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইহারা সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে ও শ্রদ্ধা-সহকারে রিভিউ অব রিভিউজ পাঠ করিবেন। বিলাতের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনায়ক ব্যালফোর (Balfour) একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি কখনও সংবাদপত্র পাঠ করেন না, কিন্তু তিনিও রিভিউ অব রিভিউজের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। রিভিউ অব রিভিউজ কেবল যে অপর পত্র হইতে প্রবন্ধ-সার সংগ্রহ করিয়াই আপনার কলেবর পূর্ণ করিত তাহা নহে। প্রতি মাসে সভ্যজগতের যেখানে যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটুক না কেন, ষ্টেড তাহার উপরে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া একদিকে জগতের দৈনন্দিন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন, অন্যদিকে দুনিয়ার লোকমত গঠনের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। রিভিউ অব রিভিউজের চরিত-চিত্রগুলি আধুনিক সভ্য জগতের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের প্রাণ-বস্তুকে ভবিষ্যতের জন্য মূর্ত্তিমন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ষ্টেডের বিচার-প্রণালী

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আধুনিক সভ্য জগতের কোনো দেশে এমন কোনো শক্তিশালী লোকনায়কের অভ্যুদয় হয় নাই, যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে ষ্টেডের স্বল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ আলাপপরিচয় ছিল না। তিনি কেবল যে জগতের দৈনন্দিন ঘটনাগুলি জানিতেন তাহা নহে, কিন্তু এই সকল ঘটনার অন্তরালে যে ব্যক্তিগত চরিত্র লুকাইয়া থাকে, নখদর্পণের ন্যায় সর্ব্বদা তাহাও প্রত্যক্ষ করিতেন। সুতরাং ষ্টেড্ কখনো

কেবল বাহিরের কার্য্যাকার্য্যের দ্বারা কোনো বিষয়ের ভালমন্দের বিচার করিতেন না। কিন্তু এই সকল কার্য্যাকার্য্যের ভিতরে যে মানুষের প্রাণ, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের শক্তি ও সংযম, মানুষের লক্ষ্য ও অভীষ্ট জড়াইয়া থাকে, তাহার দ্বারা এ সকলের বিচার করিতেন। আর এই জন্য প্রত্যেক দেশের কর্ম্মীগণ একদিকে যেমন তাঁহার মন্তব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথা শুনিতেন, অন্যদিকে সেইরূপ কেবল বাহির হইতে যাহারা সকল বিষয়ের বিচার আলোচনা করেন, তাহারা অনেক সময়ে ষ্টেডের বুদ্ধির স্থিরতা ও মতামতের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য নাই বলিয়া প্রায় তাঁহার মন্তব্যকে উপেক্ষা করিতেও চেষ্টা করিতেন। যে মানুষ নিজের নিকটে সর্ব্বদা খাঁটী হইতে চাহে, লোকচক্ষে তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা প্রমাণিত করা অসম্ভব। মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে। সত্যের সকল দিকটা সর্ব্বদা এক সঙ্গে তাহার চক্ষুগোচর হয় না। আমাদের সকল সিদ্ধান্তেই অন্ধের-হস্তিদর্শন-ন্যায়টা প্রায় সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইতে পারে। এবং তার জন্য জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্ব্বপ্রকারের সিদ্ধান্ত উত্তরোত্তর পূর্ণতর হইতে যাইয়াই পরিবর্ত্তিত হয়। লোকে যাহাকে সচরাচর স্থিরমতি বলে তাহা অনেক সময়ে কেবল রুদ্ধগতির লক্ষণ। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই রুদ্ধগতিকে arrested development বলে। কিন্তু ষ্টেডের মনের গতি আমরণ রুদ্ধ হয় নাই। বয়স তাঁহার বাড়িয়াছিল, কিন্তু শৈশবের সারল্য, যৌবনের উদ্যম, জ্ঞানের পিপাসা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মের চেষ্টা, এ সকলের বিন্দু পরিমাণ কমে নাই। জগতের অনেক লোক প্রকৃত পক্ষে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইতে না হইতেই মরিয়া যায়। নূতন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করিয়া নূতন শক্তি সংগ্রহ ও নূতন চেষ্টার প্রকাশ, নিত্য নূতন জ্ঞান বা নিত্য নূতন রস আস্বাদন, নিত্য নূতন কর্ম্মের আয়োজন, এ সকলই প্রকৃত

জীবনের লক্ষণ। কিন্তু জগতের অধিকাংশ লোক জীবিত থাকিয়াও জীবনের এ সকল লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে না। আর এই সকল লোকের বিষয়েই সচরাচর আমরা জীবন্ত-মৃত্যুর স্থবিরতার মধ্যে তাহাদের রুদ্ধবুদ্ধির স্থিরতাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ষ্টেড প্রকৃত অর্থে জীবিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি যে প্রাকৃত-জনসুলভ স্থিরত্ব লাভ করে নাই ইহা আশ্চর্য্য নহে। তাঁহার মতামতের মধ্যে যে সঙ্গতির অভাব দেখা যাইত তাহা কেবল বাহিরের কথা, ভিতরের কথা নহে।

ষ্টেড্ ও রুশ সম্রাট

ষ্টেড্ আজীবন প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। যখন যেখানে প্রজামণ্ডলী আপনাদের স্বত্বস্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে, ষ্টেড্ তখন তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্য তিনি বুয়র যুদ্ধের সময় নিজেদের গভর্ণমেণ্টের সমর্থন না করিয়া বুয়র নেতৃবর্গের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আর এই কারণে সেই সময়ে তিনি অতিমাত্রায় সাধারণ ইংরেজমণ্ডলীর বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। অথচ যে সিসিল রোডস্ (Cecil Rhodes) প্রকৃত পক্ষে চক্রান্ত করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত করান, ষ্টেড সর্ব্বদা সেই সিসিল রোডসের স্তুতিবাদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেন। সাধারণ লোকে ষ্টেডের এই দুই কার্য্যের মধ্যে কোনো প্রকারের সঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ষ্টেড একদিকে যেমন জগতের সর্ব্বত্র প্রজামণ্ডলীর স্বত্বস্বাধীনতা সম্প্রসারণের ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ য়ুরোপের স্বেচ্ছাতন্ত্রের একমাত্র অধিনায়ক, রুশিয়ার জারেরও পক্ষ সমর্থন করিতেন। লোকে এ অসঙ্গতির অর্থও বুঝিতে পারে নাই। এই জন্য তাহারা

অনেক সময়ে ষ্টেডের সাধুতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছে। কেবল বাহির হইতে ষ্টেডের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিলে এ অসঙ্গতির রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয় না। সিসিল রোডসকে এবং 'জার'কে সাধারণ লোকে দূর হইতে এবং বাহির হইতে সর্ব্বদা দেখিয়াছে। তাঁহাদের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের প্রাণের অন্তঃপুরে কখনো প্রবেশাধিকার পায় নাই। ষ্টেড এই দুই জনকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বন্ধুর নিকট বন্ধু যেমন প্রাণের সকল পর্দ্দা খুলিয়া দিয়া নিঃসঙ্কোচে দাঁড়ায়, রোডস্ এবং 'জার' দু'জনে সেইরূপ একদিন ষ্টেডের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ষ্টেডের প্রকৃতিগত অকপটতার সংস্পর্শে 'জারের' জারত্বের বহিরাবরণ আপনা হইতে সরিয়া গিয়াছিল। ষ্টেডের অনাবৃত মনুষ্যত্বের সম্মুখে 'জার' জাররূপে নহে, কিন্তু শুদ্ধ মানুষরূপে একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন। 'জারের' ভিতরে যে মনুষ্যত্ব বস্তু আছে, তাহার দ্বারা ষ্টেড সর্ব্বদা 'জারের' বাহিরের কার্য্যাকার্য্যের বিচার করিতেন। এই জন্য রুশীয় গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার অবিচারে 'জারের' প্রতি ষ্টেডের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির কোনো ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারে নাই। রুশীয় গভর্ণমেণ্ট কেবল 'জার'কে লইয়া নহে। সে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাকার্য্যের জন্য 'জার' কতটা দায়ী এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো দায়িত্ব আছে কি না এ কথা বলা কঠিন। রুশের বিশাল ও জটিল শাসনযন্ত্রে 'জার' একটী অঙ্গ মাত্র। রুশিয়ার রাজশক্তি ও প্রজা প্রকৃতির অনাদিকৃত কর্ম্মবশে রুশের স্বেচ্ছাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, কেবল রাজার ইচ্ছায় বা আভিজাতবর্গের চেষ্টায় ইহা গড়িয়া উঠে নাই। এখন সে স্বেচ্ছাতন্ত্র কেবল রুশ-রাজের উদার অভিপ্রায়ের বলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাজা ও প্রজা উভয়ের কর্ম্মক্ষয় না হইলে, কখনো রাজ্যের এ সংস্কার সাধিত হইবার নহে। গুপ্তহত্যায়

কর্ম্ম-বোঝা বাড়িয়াই যায়, ক্ষয় হয় না। এ পথ স্বাধীনতার পথ নহে। সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ যে দিন আপনার কর্ম্মক্ষয় করিতে পারিবে, তাহাদের পুরুষ পরম্পরাগত তমঃ নষ্ট হইয়া যে দিন তাহাদের আত্মচৈতন্যের উদয় হইবে, সে দিন গুপ্তহত্যার প্রয়োজন থাকিবে না; এভাবে বিদ্রোহের প্রয়োজন অনাবশ্যক হইবে; কিন্তু আপনা হইতে রাজাপ্রজার পরস্পরের অধিকারের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। এই মীমাংসার পথে রুশের 'জার' প্রকৃতপক্ষে অন্তরায় নহেন। ইহার প্রধান অন্তরায় বিপ্লবপন্থীগণ। বিপ্লবপন্থীগণ যতদিন গুপ্তহত্যা প্রভৃতি হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত 'জারের' পক্ষে রাজপুরুষদিগের অত্যাচার নিবারণ করা অসম্ভব। সাধারণ লোকে ইহা বোঝে না। সাধারণ লোকে 'জারের' মনুষ্যত্ব যে কতটা ইহা জানে না। আর তার জন্য তাহারা সরাসরিভাবে বিচার করিয়া রুশ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যাকার্য্যের জন্য 'জার'কে দায়ী করিয়া থাকে। ষ্টেড 'জারকে' চিনিতেন। 'জারের' রাজৈশ্বর্য্য নয় কিন্তু নিরাভরণ মানুষী মূর্ত্তি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রুশ শাসন যন্ত্রের জটিলতাও তাঁর চক্ষুগোচর হইয়াছিল। এই যন্ত্র চালনায় 'জারের' শক্তিসাধ্য যে কি এবং অধিকার ও অবসরই বা কতটুকু ইহাও তিনি জানিতেন। আর এ সকল জানিতেন বলিয়া রুশের রাষ্ট্রীয় শক্তির ও বিপ্লব শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যে সকল অমানুষী কাণ্ড ঘটিত, সে সকলের জন্য 'জারকে' তিনি দায়ী মনে করিতেন না। রুশের রাষ্ট্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে 'জার' যেমন অবস্থার দাস এবং ঘটনাচক্রের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া আছেন, সিসিল রোডসও দক্ষিণ আফ্রিকায় সেইরূপই অবস্থার দাস ও ঘটনাচক্রের ক্রীড়নক হইয়া ছিলেন। আর এই জন্য ষ্টেড বুয়র-ব্রিটিশ সংগ্রাম ঘটিত কার্য্যাকার্য্যের জন্য সিসিল রোডসকেও কখনো সাক্ষাৎভাবে দায়ী করেন নাই।

ষ্টেডের চরিত্রের জটিলতা সকলে বুঝিতে পারুক বা না পারুক, তাঁহার চরিত্রের স্বচ্ছতায় ও তাঁহার অকৃত্রিম সত্যানুরাগে, তাঁহার সরল স্বদেশ-বাৎসল্যে ও গভীর মানবপ্রেমে সকলেই মুগ্ধ ছিল। এক প্রকারের সত্যানুরাগ ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ; যেখানে ব্যবসাবাণিজ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে, সেখানে দোকানদারীর ভিতর দিয়া এক প্রকারের সত্যবাদিতা ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সত্যবাদিতা ব্যতীত সে ক্ষেত্রে কেহ আপনার ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারে না। এই জাতীয় সততাকে লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ প্রবাদ-বচনে সততাকে শ্রেষ্ঠতম নীতি—অনেষ্টিকে বেষ্ট পলিসি (Honesty is the best policy)—বলিয়াছে। ষ্টেডের সত্যপরায়ণতা এই শ্রেণীর ছিল না। তাহা অকপট সত্যানুরাগ ধর্ম্মানুরাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্য তিনি যখন যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, সেইভাবে কাজ করিতে যাইয়া, অনেক সময় আপনার বিস্তর ক্ষতিও করিয়াছেন। ব্রিটিশ-বুয়রের যুদ্ধের সময় তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এই অকপট সত্যানুরাগের জন্য ইদানীং তাহার নিজের সমাজে এবং কিয়ৎ পরিমাণে অন্যান্য দেশে ষ্টেডের প্রতিপত্তি কিছু কমিয়া গিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরলোক গমনের পর হইতে ষ্টেড পরলোক তত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, ইংরেজিতে যাহাকে স্পিরিটুয়্যালিজ্‌ম (Spiritualism) বলে, তার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মৃত লোকের আত্মা যে জীবিতদিগের সঙ্গে উপযুক্ত "মিডিয়াম" পাইলে কথাবার্ত্তা কহেন ও এমন কি কখনো কখনো ভৌতিকরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের চক্ষুগোচরও হন, ষ্টেড্ কিছুদিন হইতে ইহাতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। এই স্পিরিটুয়্যালিজ্‌মের অনুশীলন করিবার জন্য তিনি লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী উইম্বেলডেন্ নামক স্থানে একটা বাড়ী করিয়া, মাহিনা দিয়া লোক রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে, দৈনন্দিন

বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই তিনি কিছুকাল এই বিষয়ের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময়ে কখনো কখনো তিনি জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে পরলোকগত মনীষীগণের মতামত জানিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে পরলোক-তত্ত্বের অনুশীলনের সত্যাসত্য বা ভালমন্দ বিচারের এ সময় নহে, এ স্থানও নহে। সকলে বা অনেকে যে এ যুগে এ সকল ভৌতিক কাণ্ডে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, এমনটা আশা করা যায় না। বরং অধিকাংশ লোকেই এ সকল প্রয়াসকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। সুতরাং বিলাতের বা য়ুরোপের তর্কবাদীদিগের সমক্ষে এ সকল তত্ত্বের আলোচনা বড় কম সাহসের পরিচয় দেয় না। ষ্টেড্ অকুতোভয়ে তাঁর সিয়ান্সে (Seanceএ) যে সকল কথাবার্ত্তা হইত, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে তাহা বাহির করিতেন। ইহাতে অনেক লোকে তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, ইহা তিনি জানিতেন। এজন্য তাঁহার ব্যবসায়েরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল, ইহাও তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু যাহা নিজে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, লোকের মুখ চাহিয়া তিনি কখনো তাহা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে তাঁহার চরিত্রের জোর কতটা ছিল, ইহা সহজে বোঝা যায়। এ বিষয়েও ষ্টেড্ ইংরেজের সেরা ছিলেন।

যেমন তাঁহার সত্যানুরাগ, তেমনি তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও মানব-হিতৈষাতে ষ্টেড্ ইংরেজ চরিত্রের উচ্চতম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজ তাহার দেশকে যেমন ভালবাসে, জগতের আর কোনো জাতির লোক বোধ হয় তাদের নিজেদের দেশকে তেমন ভালবাসে না। ইংরেজের প্রেম কাজে ফোটে কেবল ভাবে বা কথায় উচ্ছ্বসিত হয় না। ষ্টেড্ স্বজাতিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, দুনিয়ায় যে ইংরেজের মত আর কোনো জাতি ছিল বা আছে ভিতরে ভিতরে তিনি যে তাহা বড় বিশ্বাস

করিতেন, এমন মনে হয় না। তাঁহার চক্ষে ইংরেজ আদর্শ মানুষ। কিন্তু সে ইংরেজ খাঁটি ইংরেজ, ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের উন্নত আদর্শভ্রষ্ট যে সকল লোক জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া ইংরেজ নামে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে, ষ্টেডের চক্ষে সে সকল ইংরেজ আদর্শ মানুষ ছিল না। এইজন্য ইংরেজের মধ্যে যা কিছু ভাল, তাহাই তিনি রক্ষা করিবার ও বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, মন্দকে কখনো আদর করিয়া পুষিয়া রাখিতে চান নাই। ব্রিটিশ উপনিবেশে এবং ভারতবর্ষে আসিয়া যে সকল ইংরেজ ইংরেজত্ব ভ্রষ্ট হইয়া যায়, যাহারা ইংরেজের সত্যবাদিতা, ইংরেজের ন্যায়পরতা, ইংরেজের উদারতা, ইংরেজের মানবহিতৈষা ভুলিয়া গিয়া একটা অযথা ও আত্মঘাতী অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, অপর জাতির লোকের উপরে অন্যায় প্রভুত্ব ও অমানুষিক অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাদের ইংরেজত্বের প্রতি ষ্টেডের বিন্দু পরিমাণে সহানুভূতি ছিল না। অন্যদিকে ষ্টেডের মানবহিতৈষাও, বলিতে গেলে, তাঁহার গভীর স্বজাতি বাৎসল্যের রূপান্তর মাত্র ছিল। তিনি আপনার জাতিকে ও আপনার সভ্যতা ও সাধনাকে এতটা ভালবাসিতেন যে একদিকে যেমন সেইজন্য নিজের জাতির আদর্শ ও চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিবার ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে, এই আদর্শ ও এই সভ্যতা ও সাধনা যাহাতে জগতের সকল লোকে আয়ত্ত ও অধিকার করিতে পারে, তাহার জন্যও সর্ব্বদা লালায়িত ছিলেন। দুনিয়ার লোক ইংরেজের মত স্বাধীন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হউক, ইংরেজ রাষ্ট্র যেমন নিয়মতন্ত্র সম্মত, ইংরেজ রাজা যেমন প্রজামতের অধীন, সকল দেশের রাষ্ট্র ও রাজা সেইরূপ হউক, ষ্টেড সর্ব্বদা ইহা চাহিতেন। তাহার জন্য জগতের যেখানে প্রজাস্বত্ব সম্প্রসারণে সঙ্গত প্রয়াস হইতেছে দেখিতেন, যেখানে স্বেচ্ছাতন্ত্রের স্থানে নিয়মতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আয়োজন বা চেষ্টা হইতেছে শুনিতেন, সেখানে সেই সকল

প্রয়াসের প্রতি সর্ব্বদা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইতেন। কি পোল্যাণ্ডের, কি ফিন্ল্যাণ্ডের, কি মিশরের, কি ভারতবর্ষের, কি চীনের, কি পারশ্যের, সকল দেশের স্বাধীনতার উপাসকগণ বিলাতে যাইয়া, তীর্থস্থানে যেমন দেশদেশান্তরের যাত্রী মিলিত হয়, সেইরূপ ষ্টেডের বাড়ীতে সম্মিলিত হইতেন। এখানে আফ্রিকার কাফ্রি লোকনায়ককে দেখিয়াছি। পারশ্যের প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কগণকেও দেখিয়াছি। যাঁহারা তুরস্কের রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেখানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সেই ইয়ং টার্ককে (Young Turksকে) এখানে দেখিয়াছি। ফিন্ল্যাণ্ডে, পোল্যাণ্ডে সকল দেশে যাহারা স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, বিলাতে গেলে, ষ্টেডের বাড়ীতে সকলেরই নিমন্ত্রণ হইত, সেখানে সকলেই মিলিত হইতেন। ষ্টেডের বৈঠকখানা আধুনিক সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠজনের একটা পবিত্র সম্মেলন ক্ষেত্র ছিল, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর এই অদ্ভুত সম্মেলন গৃহস্বামীর উদার মানবপ্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দান করিত।

জীবদ্দশায় ষ্টেড যে সকল উন্নত আদর্শের কথা প্রচার করিতেন, মরণ সময়েও তাহারই চরণে আত্মবলিদান দিয়া গিয়াছেন। মরণকালেই মানুষকে সত্যভাবে চেনা যায়। অকুল পাথারে পড়িয়া মানুষের সংসারের সকল আশ্রয় যখন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই তাহার জীবনের সত্যিকার সাধনাটা যে কি ছিল, তাহা আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ষ্টেডেরও তাহাই হইয়াছে। অবলাকুলের হিতব্রতে ষ্টেড্ যৌবনের প্রারম্ভে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই ব্রতের সাধনে Maiden Tribute রচিত ও প্রকাশিত হয়। তাহার জন্য কারাগারে তাঁহার লাঞ্ছনা। অসহায়ের সহায়তা করিতে ষ্টেড্ কখনও পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তাঁহার শত্রুরাও এমন কথা বলে না। আর অকুল সমুদ্রে ভগ্ন অর্ণবতরী বক্ষে, অবলা ও শিশুদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া শেষে

ধীর ভাবে, আপনি সেই জাহাজের সঙ্গে অতলে ডুবিয়া গিয়া ষ্টেড্ সেই পবিত্র জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ইংরেজ চরিত্রের মহত্ত্ব কোথায়, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দেবত্বটুকু কোন্‌খানে,—টাইট্যানিক জাহাজের এই অন্তিমদৃশ্যে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পবিত্র দৃশ্য যখন মানসপটে ভাসিয়া উঠে, তখন আর ইংরেজ জাতিকে অশ্রদ্ধা, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লোকে ইদানিং কেবল একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া জানিত। কিন্তু ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতার, সাধারণ নব্যশিক্ষা প্রাপ্ত সমাজে তিনি একজন সদ্বক্তা এবং সাহিত্যিক বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। সে সময়ে বাগ্মী-সমাজে কেশবচন্দ্রের পরেই নগেন্দ্রনাথের নাম হইত। আর বাংলা সাহিত্যেও একজন চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে"র তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ বাংলা এবারতের প্রচুর আদর করিতেন। এমন কি তিনি একবার ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন যে খাঁটি বাংলা কাকে বলে, তাহা জানিতে ও শিখিতে হইলে, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি পড়া আবশ্যক। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজেরও প্রভূত প্রভাব ছিল। দেশের ইংরেজিনবিশেরা প্রায় সকলেই কমবেশী ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের হিন্দু পুনরুত্থানের সুর তখনও ভাল করিয়া জাগে নাই। ব্রাহ্মসমাজেও গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয় নাই। ইংরেজি শিক্ষার ফলে প্রায় সকলেই দেশের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব ও রীতিনীতির প্রতি অনাস্থাবান হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে কেহ বা একেবারে নিরীশ্বর জড়বাদী হইয়া পড়িতেছিল, আর কেহ বা ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার সত্তামাত্রজ্ঞেয় ঈশ্বরবাদ আশ্রয় করিয়াছিল। এই সত্তামাত্রজ্ঞেয় ঈশ্বরতত্ত্বকে ইংরেজিতে ডিইজিম্ (Deism) বলে। কেশবচন্দ্র প্রভৃতির নিজের সাধনধর্ম্ম ঠিক ডিইজিম্ ছিল, এমন বলা

যায় না। এই ঈশ্বরতত্ত্বে উপাসনাদির কোনও স্থান নাই। ভজনার প্রয়োজনে ঈশ্বরতত্ত্বকে সগুণ করা আবশ্যক। নির্গুণের ভজনা হয় না। আমাদের শাস্ত্রে "ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্যতঃ নির্গুণ ঈশ্বর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই তত্ত্ব

অবিদিতাদথবিদিতাদধি,

যাহা জানি না তাহা নহে, যাহা জানি তাহার অতীতে। এই তত্ত্ব

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং,

যে বলে সে জানে,সে জানে না; যে বলে জানি না, সেই কিছু জানে। এই তত্ত্ব অদৃশ্য—ইন্দ্রিয়াতীত। আর

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি।

অদৃশ্যেতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে ভাবনা হয় না। তাহা প্রাকৃত জ্ঞানবুদ্ধির একান্ত অতীত। সে বস্তুর উপাসনা অসম্ভব। উপাসনা এই নির্গুণ ব্রহ্মের হয় না। সমাধিতে তাঁহাকে ধরা যায়, বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। পূজা হয় কেবল ঈশ্বরের; আর ঈশ্বর বলিতে আমাদের শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ব্রহ্মকে বুঝায় না। সগুনতত্ত্বকেই বুঝায়। কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের ঈশ্বরতত্ত্ব একদিকে নির্গুণ বলিয়া সাধনভজনের অতীত হইলেও, অন্যদিকে যে ঈশ্বরের ভজনা ইহারা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা সগুণ। উপাসনাঙ্গে এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ডিইজিম্ নহে। তত্ত্বাঙ্গে ইহাকে ডিইজিম্ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি না, সন্দেহ। আর চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের ইংরেজিনবিশেরা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বকে বেশি করিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহার সাধনাঙ্গকে সে পরিমাণে অবলম্বন করেন নাই। প্রকাশ্যভাবে যাঁরা ব্রাহ্মমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মোপাসনার ধার কেবল তাঁরাই ধারিতেন। শিক্ষিত সাধারণে ব্রাহ্মসমাজের ডিইজিমের মতগুলি বেশি ধরিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া সেকালে দেশের ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিক্ষার্থী সমাজে

ব্রাহ্ম সমাজের প্রভূত প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আর সে সময়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও দেশের ইংরেজিনবিশদিগের চিন্তা-নায়কগণের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথের যেরূপ শক্তিসাধ্য এবং বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, তার গুণে আজি পর্য্যন্ত তিনি সে স্থান অধিকার করিয়া থাকিতেন। এক দিকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, অন্য দিকে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি ক্রমে সে স্থান হইতে সরিয়া পড়েন। কিন্তু তথাপি বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম লুপ্ত হইবে না। নগেন্দ্রনাথই সর্ব্ব প্রথমে বাংলা ভাষায় প্রকৃত জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করেন। নগেন্দ্রনাথের পার্কারের জীবনচরিত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ম্যাট্‌সিনীর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু যোগীন্দ্রচন্দ্র বাংলায় বিদেশীয় মহৎজীবনের চিত্রাবলী সর্ব্ব প্রথমে প্রচার করিয়া থাকিলেও, নগেন্দ্রনাথের রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতই যে বাংলা ভাষায় সর্ব্ব প্রথম মৌলিক জীবনালেখ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার পরে আরো অনেকে বাংলায় জীবনচরিত লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী; শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদ্যাসাগর"; উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের "কেশবচন্দ্র"—এ সকলেই বাংলার জীবনী সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও গবেষণার মৌলিকতায় এবং সমালোচনার ঔদার্য্য ও সূক্ষ্মতায় নগেন্দ্র-নাথের রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে, ততদিন নগেন্দ্রনাথের এই জীবনচরিতখানির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

যেমন রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, সেইরূপ নগেন্দ্রনাথের "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"ও বাংলা সাহিত্যে একখানি মৌলিক গ্রন্থ। স্বর্গীয়

রাজনারায়ণ বসু এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উভয়েই নগেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। আর ইঁহারা বাংলা সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, নগেন্দ্রনাথ সে স্থান পান নাই এবং পাইবেনও না। কিন্তু কোনো কোনো দিক দিয়া বিচার করিলে, তাঁর "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" বাংলায় যে কেবল নূতন গ্রন্থ তাহা নহে, সাহিত্যের দর্শন শাখাতে এখানি যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থে যে সকল সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বের চিরন্তর সমস্যা। মানুষ যতদিন এ সমস্যা সকলও কোনো না কোনো আকারে ততদিন রহিয়াছে, আমি কে? এই বিশ্ব কি? ঈশ্বর বা বিধাতার স্বরূপ কি? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের কষ্টিপাথর কোথায়? এ সকল প্রশ্ন সনাতন। যুগে যুগে স্মরণাতীত কাল হইতে, দেশে দেশে, মানুষের প্রাণ ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে ও বেড়াইতেছে। কেহ এ পর্য্যন্ত এ সকলের নিতান্ত নিঃশেষ উত্তর পান নাই। এক যুগের মীমাংসা পরবর্ত্তী যুগে নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া, নূতন সন্দেহ উৎপাদন করিতেছে, আবার সেই সন্দেহ হইতে নূতন বিচার ও নূতন মীমাংসাতে যাইয়া পৌঁছিতেছে। এই ভাবে ধর্ম্মের ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে। এ ক্ষেত্রে কোনো মীমাংসা চূড়ান্ত হয় না। নগেন্দ্রনাথের মীমাংসাও চূড়ান্ত হইয়াছে, এমন বলা যায় না। কিন্তু "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"র মূল্য তার সিদ্ধান্তে তত নয়, যতটা তার আলোচনা ও বিচারের প্রণালীতে। ধর্ম্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্বসকলের এমন বিশদ আলোচনা বাংলা ভাষার তো কথাই নাই, ইংরেজিতেও আছে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দেশের শ্রেণী বিশেষের মধ্যে কিছুকাল হইতে যে একটা অমর্য্যাদার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে তার জন্য ব্রাহ্মসমাজের বাইরে নগেন্দ্রনাথের "ধর্ম্ম

জিজ্ঞাসা” বইখানির তেমন প্রচার হয় নাই বলিয়া অনেকে এই গ্রন্থখানির প্রকৃত মূল্য যে কতটা, ইহা ভাল করিয়া জানেন না। কিন্তু ক্রমে এ সকল কলহকোলাহল থামিয়া যাইবে। সাহিত্য সমালোচনার পক্ষপাতশূন্য ধর্ম্মাধিকরণে তখন নগেন্দ্রনাথের “ধর্ম্মজিজ্ঞাসা”র প্রকৃত দাবী যে পূর্ণমাত্রায় ডিক্রি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর তখন বাংলা সাহিত্যিকেরা, সাহিত্যক্ষেত্রে নগেন্দ্রনাথের স্থান কোথায়, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যের দ্বারা নিস্পিষ্ট এবং সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতরে না পড়িয়া গেলে, নগেন্দ্রনাথ আজ বাংলা সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান অধিকার করিতেন, সন্দেহ নাই। অথচ, নগেন্দ্রনাথের মধ্যে, প্রকৃত পক্ষে, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা অতি অল্পই ছিল। আর সে সংকীর্ণতা এতটা কমই ছিল বলিয়া, তিনি ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও সাধন সম্পত্তির উপযোগী প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা পান নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা তাত আছে; একটা সুচীবাই আছে; একটা লোক-ভীতি আছে। ইংরেজীতে যাকে self-consciousness বলে, যে কথার বাংলা প্রতিশব্দ আপাততঃ খুঁজিয়া পাইতেছি না, আছে কি না, জানি না,—যে self-consciousness থাকিলে লোকে সর্ব্বদা কোনখানে পান হইতে চুন খসিয়া পড়িল, এই ভাবনায় সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে,— ব্রাহ্মধর্ম্মে এই ভাবটা খুব আছে। আর এই জন্য অনেকে ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরের লোকের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া সহজ ভাবে মিলিতে মিশিতে পারেন না। নগেন্দ্রনাথের মধ্যে এ ভাবটী আদৌ ছিল না। তিনি অনেকটা সহজ মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই তাতে শিবনাথ শাস্ত্রীর মত লোকের কবিস্বভাবসুলভ রসরসিকতাপূর্ণ প্রাণটাকে শুকাইয়া কাঠ করিয়া দিয়াছে,—কিন্তু নগেন্দ্রনাথের প্রাণের সহজ ও স্বাভাবিক সরস ও মুক্ত ভাবকে নষ্ট করিতে পারে নাই।

নগেন্দ্রনাথকে বিশেষ বিশেষ বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বসিয়া, নিঃসঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া, নিধু বাবুর টপ্পা গাইতে শুনিয়াছি। যে নগেন্দ্রনাথ একদিকে মিল্ ও স্পেন্সারের নীরস ফিলজফিতে মগ্ন হইয়া যাইতেন, তীক্ষ্ণ তর্কের দ্বারা পরমতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিতেন, সেই নগেন্দ্রনাথই আবার তাঁর মিষ্টি গলায় ভাবে বিভোর হইয়া বন্ধুবান্ধবদের মাঝখানে বসিয়া গাহিতেন :—

নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ আর এ'ল না।
সারাদিন ফুল তুলে, বোঁটাগুলি দিনু ফেলে,
(শ্রীঅঙ্গে লাগিবে বলে)— ।

অন্য সময় বা গলা ছাড়িয়া বিশুদ্ধ তান লয় সংযোগে প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেন :—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
ও মুখে মধুর হাসি, দেখতে বড় ভালবাসি ;
তাই তোমারে দেখতে আসি,
দেখা দিতে আসিনে ॥
সলিলে ডুবাও যদি, সলিলেতে রব,
তুমি যদি ভালবেসে থাক, সব প্রাণে সব।
তুমি যদি সুখে থাক, পুড়িতে পারি আগুনে ॥

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই কৃষ্ণলীলা কথা সহিতে পারেন না। অজ্ঞ খৃষ্টীয়ানেরা কৃষ্ণচরিত্রকে যে চক্ষে দেখে, ইহারাও প্রায় সেই চক্ষেই ইহাকে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের মধ্যে কখনও এই কৃষ্ণভীতিটা দেখিতে পাই নাই। বৈষ্ণবেরা, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, যে ভাবে কৃষ্ণতত্ত্বকে গ্রহণ করেন, নগেন্দ্রনাথ সে ভাবে তাহাকে কখনও গ্রহণ করেন নাই। তিনি অবতারবাদ মানিতেন না, ইহাই জানি। সাকারোপসনাকে তিনি কোনো অধীকারীর পক্ষেই

সত্য বা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন না। এ সকল বিষয়ে তাঁর ধর্ম্ম মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মই ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিতেন। কথায় যেমন বলে—"কৃষ্ণ কেমন ? না যার মনে যেমন ;"—নগেন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার মনোমত করিয়া কৃষ্ণনামের ও কৃষ্ণলীলার অর্থ করিয়া লইতেন, এবং আপনার অর্থে ও আপনার ভাবে তার রস আস্বাদন করিতেন। কিন্তু তাঁর উদার চিত্তে কোটী কোটী লোকে যাঁর ভজন করে, তাঁর প্রতি কোনো অমর্য্যাদা বা বিরুদ্ধভাব স্থান পাইত না। বরঞ্চ ব্রহ্মসংগীতে তিনি যে রস পাইতেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে তদপেক্ষা কম রস পাইতেন, এমন কখনই মনে হয় নাই।

সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম,
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো !
আকুল করিল মোর প্রাণ !

এই কীর্ত্তনে তাঁর কণ্ঠে যে রসের ফোয়ারা ছুটিত, এই গানটী গাইতে গাইতে তাঁহাকে যতটা ভাবে বিভোর হইয়া যাইতে দেখিয়াছি,—কোনো ব্রহ্মসংগীতে তাঁর মধ্যে সে ভাব দেখিতে পাই নাই। আর ইহার প্রধান কারণ এই ছিল যে এ গানটীতে তাঁর অন্তরঙ্গ সাধনতত্ত্বটা সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠিত। নামজপ নগেন্দ্রনাথের সাধনের মুখ্য অঙ্গ ছিল। আর মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মের নামসাধনে এবং নগেন্দ্রনাথের নামসাধনে বিশেষ পার্থক্যও ছিল মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মের নামেতে গুরু-শক্তি-সঞ্চার নাই। এই নামজপের সঙ্গে প্রাণায়ামেরও কোনও সম্পর্ক নাই। আর প্রানায়ামশূন্য নামজপে বস্তুলাভ কখনও হয় কি না জানি না ; কিন্তু তেমন ভাবে যে ভাবাঙ্গসাধন হয় না, ইহা জানি ; নাম যখন প্রাণায়াম-শুদ্ধ-দেহে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আপনি বহিতে থাকে, তখনই কেবল—"জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো !" এই ভাবটী প্রত্যক্ষ করা যায়।

বৈষ্ণবতত্ত্ব কেউ মানুক বা না মানুক, গুরুদত্ত নামপ্রভাবে সুকৃতিসম্পন্ন জীবের অন্তরে বৈষ্ণবসাধনের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে।

বলিতে বলিতে রাই. মূরছিত ভেল!
এই যে কথা কহিতেছিল—রাই ধনী,
এই যে কৃষ্ণকথা কহিতেছিল।
কথা কইতে কইতে এমন হলো!
কৃষ্ণকথা কইতে কইতে,—কেন এমন হলো!
বলিতে বলিতে রাই, মূরছিত ভেল।

গুরুদত্ত মন্ত্র-দীক্ষা প্রাপ্ত সাধকের অন্তরে এই সকল লীলাতত্ত্বের নিগূঢ় সত্য ও শক্তি আপনি স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লীলারস নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা আস্বাদন করিতেন,—এ সকল কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। আর অন্তরে এই সকল রস আস্বাদন করিতেন বলিয়া, কৃষ্ণাবতার প্রভৃতি বৈষ্ণবমত অস্বীকার করিয়াও, নগেন্দ্রনাথ কখনও কোনো দিন "কৃষ্ণপ্রেম-বৈমুখী" ছিলেন না।

ফলতঃ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বস্তুকে যে জীবনে ও চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিবে, তার পক্ষে বৈষ্ণবমত বর্জ্জন করা সম্ভব হইলেও, বৈষ্ণব সাধনে ও সাহিত্যে যে সকল অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শের অনুসরণ যে করিবে, সে কদাপি "কৃষ্ণপ্রেমবৈমুখী" হইতে পারে না। রস-সাধনের এমন পথটী আর তো দুনিয়ায় নাই। নগেন্দ্রনাথ মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ শিক্ষা প্রথম যৌবনে তিনি থিওডোর পার্কারের নিকটে প্রাপ্ত হন। সেকালে থিওডোর পার্কারই ব্রাহ্মসমাজের গুরু ছিলেন। তাঁর Solid Pietyই ব্রাহ্মসাধনার লক্ষ্য ও উপজীব্য ছিল। পার্কার ইহাকে

Harmonious Development বলিতেন। ব্রাহ্মসমাজের সেকালের সাহিত্যে ইহাকেই সর্ব্বাঙ্গীন বা সমঞ্জসীভূত উন্নতি বলা হইত। আমরণ নগেন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের এই আদর্শটীকে ধরিয়া রহিয়াছিলেন। আর এই জন্য তিনি একদিকে কঠোর জ্ঞানসাধন করিতেন; অন্যদিকে সর্ব্বতোভাবে রসসম্ভোগেও আপনাকে একেবারে ভাসাইয়া দিতেন। আর বৈষ্ণবপদাবলীতে রসতত্ত্ব ও ভাবাঙ্গসাধন যেমনতর ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, আর কোথাও তেমন হয় নাই বলিয়া তিনি নিঃসঙ্কোচে, একান্ত অকুণ্ঠাসহকারে, প্রাণমন খুলিয়া এ রসে আপনাকে ভাসাইয়া দিতেন। তাঁর ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত এ সম্ভোগের কোনও ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারিত না।

ফলতঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে কি বস্তু ছিলেন, দশআত্মার ফুটফিতা দিয়া তাঁর কালি কষিয়া মামুলী ব্রাহ্মগণ তাহা ধরিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের আওতায় পড়িয়া জীবনটা কাটাইয়া গেলেন বলিয়া, দেশের লোকেও তার মূল্য বুঝিবার অবসর পায় নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। তবে সাহিত্যে তিনি যে সকল বস্তু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারা বাংলার বিদ্বজ্জনসমাজে তাঁহার স্মৃতি বহুকাল জাগিয়া থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলা সাহিত্যের স্মৃতিমন্দিরে, দ্বিজেন্দ্রলাল কোথায়, কোন্ আসনে, কার সঙ্গে, কার নীচে, কার উপরে স্থান পাইবেন, তাহা ভাবিবার ও বলিবার সময় এখনও আসে নাই। নিক্তি যতক্ষণ না আকস্মিক আঘাত বা আলোড়নের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, একেবারে স্থির ও নিশ্চল হইয়া যায়, ততক্ষণ তার দ্বারা কোনও বস্তুর ঠিক ওজন হয় না। মানুষের মনও তো নিক্তিরই মতন। যতক্ষণ আকস্মিক অনুরাগ বিরাগাদির আঘাত ও আন্দোলন হইতে সে মন একেবারে মুক্ত না হইয়াছে, ততক্ষণ তার বস্তুজ্ঞান বা বস্তুবিচারের শক্তি জন্মায় না। কিছুদিন হইল, বাংলা সাহিত্যে একটা প্রবল দলাদলির ভাব জাগিয়া, সাহিত্যিকদিগের মনকে নানাপ্রকারে উত্তেজিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। এ অবস্থায় সত্য সাহিত্যালোচনা বা সাহিত্যিকবিশেষের প্রতিভার বা প্রয়াসের যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। মৃত্যু আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে আমাদের ক্ষুদ্র কলহ-কোলাহলের অতীতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও এই কতিপয় বৎসরের বিবাদ বিতণ্ডার তরঙ্গ যে একেবারে স্থির ও স্তব্ধ হইয়া নির্ব্বিকার শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এমনটা বলা যায় না। মনের গরম অত শীঘ্র ও অত সহজে নষ্ট হয় না। আর যেখানে মৃত্যুর কারুণ্য জাগিয়া সে কাঠিন্যকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেখানে প্রতিক্রিয়ার মুখে চিত্ত সত্যের সনাতন মধ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময় অতিনিন্দা হইতে একেবারে অতিস্তুতিতে যাইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর প্রাণ যেমন অতিনিন্দা করিতে পটু,

তেমনি অতিস্তুতি করিতেও অভ্যস্ত। ওজন রাখাটা আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধ। আর এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে হয় যে বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়, ইহার আলোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই। আধুনিক বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল কোথায়, কতটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন, এই আলোচনা বিস্তর সময়, অনেক পড়াশুনা এবং গভীর অনুসন্ধান সাপেক্ষ। কিন্তু যে স্থানেই তাঁর আসন পড়ুক না কেন, সে যে অতি উচ্চ স্থান এ কথাটা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল যদি আর কোনও কিছু না লিখিতেন, তাঁর "আমার দেশ" এই এক গানেতেই বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালীর সাধনায় তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যাইত।

আর কোনও জাতির সাধনার ইতিহাসে স্থান পাওয়া অতি বড় কথা। তার তুলনায় সাহিত্যে স্থান পাওয়া সহজ বলিয়া মনে হয়। সাহিত্য সাধনার একাংশ মাত্র। সাধনা সমগ্র জীবনের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মকে অধিকার করিয়া থাকে। কোনও জাতির সাধনা তার সমগ্র ও সমষ্টিকৃত ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্র। সাধনা একই সঙ্গে সে জাতীর জীবনের গতি ও নিয়তি হইয়া থাকে। জাতীয় জীবনের গতিতে যারা শক্তি সঞ্চার করেন, জাতীয় সাধনার ইতিহাসে কেবল তাঁহাদের নাম ও স্মৃতি রক্ষিত হয়। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনেক লোকে অনেক দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। কেহ বা ইতিহাস লিখিয়াছেন, কেহ বা উপন্যাস লিখিয়াছেন, কেহ বা সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, কেহ বা পুরাতন বা নূতন ধর্ম্মের বা তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের কারো কারো মনীষাও অসাধারণ ছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সকলে বা অনেকে যে বাঙ্গালীর সাধনাকে প্রত্যক্ষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহাদের একটু

না একটু স্থান থাকিবে। বাংলার লেখকগণের লিষ্টিতে ইঁহাদের নাম ও গ্রন্থ পরিচয় সর্ব্বদা পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাঙ্গালীর সাধনার ইতিহাসে ইঁহাদের সকলের সন্ধান পাওয়া যায় না ও যাইবে না। বাংলার আধুনিক সাধনার ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও আসে নাই। সে কষ্টিপাথরের ঘর্ষণে আমাদের এখনকার দেবমূর্ত্তিই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে। ফলতঃ কোথাও সমসাময়িক লোকেরা সত্য ও নিরপেক্ষ ভাবে আপনাদের যুগের সাধনার ইতিহাস লিখিতে পারে না। সমাজ সে ন্যায়ের তেজ সহিতে পারে না। কিন্তু যখন, যাহাদের দ্বারা, আধুনিক বাঙ্গালীর সাধনার ইতিহাস রচিত হইবে, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল যে সে ইতিহাসে একটু না একটু স্থান পাইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাধনার দুই অঙ্গ, এক ভাবাঙ্গ ও অপর কর্ম্মাঙ্গ। জ্ঞানাঙ্গ, ভাবাঙ্গ ও কর্ম্মাঙ্গ—এইরূপে সাধনার তিন অঙ্গও প্রতিষ্ঠিত করা যায় বটে। কিন্তু জ্ঞান ও ভাব এমন ওতোপ্রোতভাবে উভয়ের সঙ্গে উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া যায়, যে তাহাকে পৃথক্ করিয়া বিচার করা কঠিন, না করিলে কোন ক্ষতি হয় না। সাহিত্যিকেরা সাধনার ভাবাঙ্গে শক্তি ও প্রাণতা সঞ্চার করিয়া তাহার পরিপুষ্টি সাধন করেন। আর মানুষের জ্ঞান এবং ভাবেরও দুইটা দিক আছে, একটা তার অনিত্য দিক, আর একটা তার নিত্য দিক। একটা উপরের দিক, আর একটা ভিতরের দিক। যে সাহিত্যিক যতটুকু পরিমাণে জ্ঞানের ও ভাবের এই ভিতরের দিক, এই সনাতন দিক, এই বিশ্বজনীন দিকটাকে ফুটাইয়া তোলেন, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সেই পরিমাণে স্থায়ীত্ব ও অমরত্ব লাভ করে। আর এইরূপে যিনি জ্ঞানের ও রসের সনাতন ও বিশ্বজনীন দিকটা ফুটাইয়া তুলিয়া, কোনো জাতির চিন্তাতে ও ভাবেতে, তাহাদের আদর্শেতে ও প্রয়াসেতে সেই নিত্যদিকটাকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, সেই জাতির সাধনার ইতিহাসে তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যায়।

এই ভাবে আমাদের বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালার জাতীয় সাধনার ইতিহাসে এতটা বিস্তৃত ও উন্নত স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আমাদের মতামত যাহাই হউক না কেন, আমাদের বিচারতর্কে যাহারই প্রতিষ্ঠা করুক না কেন, আমাদের তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত যে পন্থারই আশ্রয় লউক না কেন,—আমরা বাঙ্গালী বলিয়া সজ্ঞানে অজ্ঞানে সতত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের রসে ডুবিয়া আছি। আমরা শক্তির উপাসনা করিতে যাই, কিন্তু অলক্ষিতে বৈষ্ণব হইয়া পড়ি। শ্যামকে ছাড়িয়া বাঙ্গালী শ্যামাভক্তের মনও তিষ্ঠিতে পারে না। সে কালীকৃষ্ণে এক করিয়া দেয়।

গোপনে গোকুলে এসে শ্যাম সেজেছো শ্যামা!
অসি ছেড়ে. বাঁশি ধরে, গোপীর মন
ভুলায়েছো শ্যামা!

ইহাকেই সাধনার প্রভাব বলে। ব্রাহ্মগণ তো দুরন্ত নিরাকারবাদী; জটিলা কুটিলার মতন কৃষ্ণপ্রেমের ঘোর বিবাদী। কিন্তু তবুও ব্রাহ্মসমাজের গানের বহিখানি অজীর্ণ বৈষ্ণব রসেতে পরিপূর্ণ।

(১) চঞ্চল অতি, ধাতুল মতি,
নাথ তরে ভবভুবনে।
শশি ভাস্করে, তারা নিকরে,
পুছত সলিল-পবনে।
(তোমরা কেউ দেখেছ নাকি!)

(২) কি আর বলিব আমি হে!
(আমার) শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
এ হৃদয়ে থেক তুমি।—ইত্যাদি

(৩) ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্ল্লভ,
আমি মর্ম্মের কথা, অন্তর-ব্যথা, কিছুই নাহি কব,
শুধু জীবন মন, চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব।—ইত্যাদি

এইরূপ বহুসংখ্যক ব্রহ্মসঙ্গীত বৈষ্ণবপদাবলী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রচিত হইয়াছে। আর এইখানেই বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালীর সাধনাতে কি যে অদ্ভুত শক্তিসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

যেমন বৈষ্ণব কবিগণ, সেইরূপ কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং দাশুরায় প্রভৃতিও বাঙ্গালীর সাধনাকে অশেষ প্রকারে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁদের ভাষায় কথা কই, তাঁদের উপমা ও রূপকাদি লইয়া আমাদের আধুনিক রসমূর্ত্তিসকল রচনা করি, তাঁহাদের চিন্তা ও ভাব, ভঙ্গী ও আদর্শ এ সকলই, আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমাদের মনোরাজ্যের বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত মুদ্রার মতন হইয়া গিয়াছে। রাজার টাঁকশালের টাকা পয়সা লইয়া যেমন আমরা বাহিরের হাটে বাজারে বেচাকেনা করি, সেইরূপ বাঙ্গালী জাতির মানসরাজ্যের এই সকল রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মোহরাঙ্কিত ভাষা ও ভাব লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবিধ জ্ঞান ও রসের পশরা সাজাইয়া বেচা-কেনা করি। যে সকল সাহিত্যিকের ভাষা ও ভাব তাঁদের স্বজাতির চিন্তার ও ভাবের বিপণিতে চলতি টাকা পয়সার মতন হইয়া যায়, তাঁরাই সেই জাতির সাধনার ইতিহাসে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন।

চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস বা কাশীরাম, ভারতচন্দ্র বা মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ বা দাশরথী রায়, ইহারা বাঙ্গালীর সাধনাতে যে স্থান পাইয়াছেন, আধুনিক যুগের কোনও সাহিত্যিক সে স্থান

কখনও পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার জন্য আধুনিক সাহিত্যিকদিগের অক্ষমতা দায়ী নহে। বর্ত্তমান সমাজের বিচ্ছিন্ন অবস্থাই এর জন্য দায়ী। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের দোষের কথা নয়, অতিশয় দুর্ভাগ্যের কথা মাত্র। চণ্ডীদাস বা কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম বা রায়গুণাকর, রামপ্রসাদ বা দাশরথী রায় যে বাংলা দেশকে জানিতেন, সে বাঙ্গলা দেশ আর নাই; তাহাকে আবার কখনও ফিরাইয়া আনিতে পারিব কি না, সন্দেহ। যে বাঙ্গালী সমাজের মনোরাজ্যে ইহাঁরা আপনাদের অদ্ভুত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, সে বাঙ্গালী সমাজও আর নাই। তখন আজিকার মতন রেল ষ্টিমার ছিল না, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে এমন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না; ভিন্ন ভিন্ন জেলার লোকে এতটা পরস্পরের সঙ্গে মেশামিশি করিবার অবসরও পাইত না। তথাপি এ সকল দূরগত পার্থক্য ও ব্যবধান সত্বেও তখন বাংলাদেশ ছিল একটা, বাঙ্গালী সমাজ ছিল একটা, বাঙ্গালীরা ছিল এক জাত। আজ বাঙ্গালার সে একত্ব আর নাই! বাংলাদেশ এখন দুইটা। একটা বাংলায় আমরা মুষ্টিমেয় শিক্ষাভিমানী, সভ্যতাভিমানী, ধনাভিমানী, পদগৌরবে গর্ব্বিত, বিলাস-বিভবে আচ্ছন্ন বাঙ্গালী বাস করি; আর একটা বাংলায় দেশের অশিক্ষিত, অসভ্য, নিরন্ন, বস্ত্রহীন, কোটী কোটী বাঙ্গালী বাস করে। সে কালেও কেহ শিক্ষিত ছিলেন, কেহ পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা করে নাই। সে কালেও কেহ ধনী ছিলেন, অনেকেই দরিদ্র ছিল। সে কালের রুচি ও আদর্শ অনুসারে কখনও কারো কারো ভাগ্যে ভোগবিলাস জুটিত, অনেকের ভাগ্যেই জুটিত না। বিদ্যা বা ধন, পদ বা গৌরব, ভোগ বা বিলাস আজ যে নতুন আমাদের মধ্যে আসিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু পুরাতন বাঙ্গালী সমাজে আজিকার মতন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এমন ব্যবধানটা ছিল না।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও গ্রামেতেই বাস করিতেন, গ্রামের অশিক্ষিত লোকে নিঃসঙ্কোচে আসিয়া তাঁর দালানে বা দাওয়ায় মাদুর বা দরমা পাতিয়া বসিত, তিনি যখন অধ্যয়ন করিতেন বা অধ্যাপনা করাইতেন, তখন তারা আসিয়া নীরবে তাঁর টোলের এক পাশে বসিয়া তামাক সাজিয়া তাঁহাকে দিত, আর নিজেরা বয়সোচিত সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া তামাক খাইত। পাঠপঠন সাঙ্গ হইলে, তিনি তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাঁর বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণে, উৎসবে তারা আসিয়া খাটিত, গান শুনিত, খাইত দাইত। ধনীর সঙ্গেও নির্ধনের এই সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং তখন বাঙালী সমাজ এক ছিল, তার একটা একত্ব, ঘননিবিষ্টতা, একপ্রাণতা ছিল। যাঁরা কবিতা বা সংগীত রচনা করিতেন, তাঁরা দেশের এই যে অভিন্ন গোটা প্রাণটা তারই কথা কহিতেন, তারই আকাঙ্ক্ষা ও আশা, সুখ ও দুঃখ, অভাব ও অভিযোগ লইয়া, তারই নিকটে আত্মনিবেদন করিতেন। কেউ বৈষ্ণব ছিল, কেউ শাক্ত ছিল, কেউ গৃহী ছিল, কেউ বৈরাগী সন্ন্যাসী ছিল! সকলের এক ধর্ম্ম, এক কর্ম্ম, এক সাধন, এক ভজন, এক রূপ আচার বিচার ছিল না। কিন্তু প্রাণটা সকলের এক ছিল। তাই বৈষ্ণবও শাক্তের কথা বুঝিত, শাক্তও বৈষ্ণবের কথা বুঝিত।

"সদা কালী, কালী, কালী বলে ডাকরে রে রসনা।
বেদ আগমে শিবউক্তি, ডাক রে মন মহামুক্তি,
নিতান্ত জেনেছি রে মন, শমনভয় আর রবে না॥

সকল বৈষ্ণবেই এই গানের অর্থ ও মর্ম্ম বুঝিত; ইহার ভিতরকার রসও কখনও কখনও আস্বাদন করিত না যে এমনও নহে। আবার—

"কে যায়, ব্রজনগরে; জয়রাধা শ্রীরাধার নাম লয়ে"—

অথবা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা—

"শ্যাম প্রেম সুখসাগরে, সদা মীনের মনন
ডু'বে রইতাম।
ওগো! প্রেমবিবাদিনী, পাপননন্দিনী,
কুম্ভিরিণীর মত গো। (থাকত সেই প্রেমসাগরে)
সখি! থাকত তাকে বাকে, দেখ'ত তাকে বা কে,
আপনি বিপাকে পড়িত।"

এ সকল বৈষ্ণব সঙ্গীত সকল শাক্তেই বুঝিতেন, শুনিতেন, আস্বাদনও করিতেন। লোকলৌকিকতায়, আলাপআত্মীয়তায়, যাত্রায়, গানে, পাঁচালীতে, কবির লড়াইয়ে, কথকতায়, পুরাণাদি পাঠে, সেবাতে সিন্নিতে, পূজাপার্ব্বণে,—বাঙ্গালী সমাজটা তখন জমাট বাঁধিয়া ছিল। তে হি নো দিবসা গতাঃ। এখন আমরা মুষ্টিমেয় নবশিক্ষাপ্রাপ্ত লোক এক পাশে, আপনাদের গৌরবের ও বিদ্যার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে নিঃশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না। আমরা যদিও বা পূর্ব্বপুরুষদিগের সুকৃতি ফলে তাদের ভাব ও ভাষা কিছু বুঝিতে পারি, তারা আমাদের কিছুই বুঝে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এই ভাঙ্গা হাটে আমাদের সাহিত্যের সুর কিছুতে আর জমিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কথাটা বলতে ক্লেশ হয়, কিন্তু তথাপি ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়, যে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,—ইঁহাদের কেহ প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রাণরাজ্যে এখনও প্রতিষ্ঠিত হন নাই। আমরা এক মুঠো অর্দ্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত বাঙ্গালীই কেবল তাঁহাদের চিনি; দেশের সাধারণ লোকে এখনও তাঁদেরে চিনে নাই। তাদের কথায়, তাদের সুরে সুর বাঁধিয়া ইহাদের কেহ কথা কন নাই। এই হিসাবে, সমগ্র বাংলা দেশের ও গোটা বাঙ্গালী সমাজের প্রাণগত ও চিরাগত সাধনার সঙ্গে ইঁহাদের কাহারো সত্য ও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয় নাই। এঁরা আধখানা বাংলার

মনোরাজ্য অধিকার করেন নাই, সিকিখানারও করেন নাই। হন্দমুদ্দ আনাপ্রমাণ বাংলার ক্ষুদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধনাতেই শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন। এ কারো দোষ নয়, আমাদের সকলের দুর্ভাগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল আধুনিক বাংলার এই সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, খণ্ডীকৃত সমাজজীবনের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সাধনাকেই যাহা কিছু পুষ্ট করিয়াছেন; বৈষ্ণব কবিদের ন্যায়, কিম্বা কাশীরাম কৃত্তিবাসের মতন, গোটা বাংলার প্রাণকে স্পর্শ করেন নাই। তিনি ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর সংকীর্ণ সাধনাতেই কথঞ্চিৎ শক্তিসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ এ সাধনা সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে সত্য, চিরদিন তো এমন থাকিবে না। ক্রমে ইহাও সমগ্র বাঙালীর সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া উঠিবে; আর তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশ সংগীত ও হাসির গানগুলি বাঙালী সমাজের প্রাণে প্রবেশ করিয়া তাহার ভাব ও ভক্তিকে বাড়াইয়া দিবে। যে দিন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে বাংলার সমষ্টিগত প্রাণবস্তু আপনার মধ্যে বরণ করিয়া লইবে, সে দিন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও সেখানে একটু স্থান পাইবেন। সে স্থান কতটা ও কোথায় হইবে, তাহার বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। কোম্‌ত্‌ মতে মৃত্যুর সাত বছর পরেও যে ব্যক্তির স্মৃতি জনসমাজে জাগিয়া থাকে, সে অমরত্ব লাভ করে। সাত বছর কেন, আরো বহু বৎসর দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি বাংলা সাহিত্যে জাগিয়া থাকিবে। কিন্তু পরিণামে কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কেন, আর কয়জন কবি ও সাহিত্যিকের কতটুকু টিকিয়া থাকিবে, এখনি সে কথা কে বলিবে?

তারকনাথ পালিত

বাংলাদেশের বাহিরে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের নাম এতাবৎকাল যে খুব সুপরিচিত ছিল তাহা নহে। আপনার দীর্ঘ জীবনের সমুদয় সঞ্চিত সম্পত্তি জড়বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করিয়া পালিত মহাশয় আজ একটা ভারতব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দেশবিদেশের সংবাদপত্র সকল তাঁর গুণগানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুরুষেরা তাঁর এই অনন্যসাধারণ বদান্যতার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে "নাইট" শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আজি পর্য্যন্ত বাংলাদেশে এক হাইকোর্টের জজেরা ব্যতীত অপর কেহ এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। বোম্বাইএ পার্শি ধনকুবেরদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের বদান্যতার জন্য এইরূপ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বাংলায় পালিত মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম এই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

বহুদিন হইতে বাংলায় লোকে পালিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া আসিয়াছে। অল্প বয়সে বিলাত যাইয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। সেকালে বিলাত যাওয়া এতটা সহজ ছিল না। আর বাঙালী ব্যারিষ্টারের সংখ্যাও দেশে অতি অল্প ছিল। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় পালিত মহাশয়ের পূর্ব্বেই ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ পালিত মহাশয়ের সমকালীয় লোক। কিন্তু মনোমোহন ঘোষ বা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপন আপন ব্যবসায়ে যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পালিত মহাশয় তাহা করেন নাই। অথচ পালিত মহাশয়ের শক্তিসাধ্য যে ইঁহাদের অপেক্ষা বড় বেশি হীন ছিল, এমন কথা কিছুতে বলা যায় না। বরং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় পালিত মহাশয়

ইঁহাদের অপেক্ষা কতকটা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ জগতে সর্ব্বত্র একটা অদ্ভুত ক্ষতিপূরণের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। বিধাতা যাহাকে একদিকে কিছু বেশি দান করেন, অন্যদিকে সেই আতিশয্যের "পাষাণ ভাঙ্গিবার" জন্যই বা বুঝি, তাহাকে কিছু খাট করিয়াও রাখেন। একটু তলাইয়া দেখিলে এটা বুঝিতে পারা যায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যার থাকে, ধীরতা তার তেমন থাকে না। সহজে যে জটিল বিষয় ধরিতে বা বুঝিতে পারে, গভীর বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনোনিবেশ করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস তার প্রায় দেখা যায় না। মেধা ও শ্রমশীলতা ক্বচিৎ একসঙ্গে বাস করে। পালিত মহাশয়ের তীক্ষ্ণ মেধাই বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর ব্যবসায়ে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব লাভের অন্তরায় হইয়াছিল। আর এইজন্য তিনি অধিকাংশ সময় ফৌজদারী মামলাতেই নিযুক্ত হইতেন। ফৌজদারী মামলায় এক সময়ে বাঙালী ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মতন এমন সুদক্ষ লোক আর কেহ ছিলেন না বলিলেও হয়। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রতিপত্তি কতকটা বেশি ছিল. সত্য, কিন্তু ঘোষ মহাশয় কেবল আপনার ব্যবহারকুশলতা গুণে এই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। ঘোষ মহাশয়ের যে কর্ম্মকুশলতা, যে লোকরঞ্জন শক্তি, যে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য ছিল, সে সকল গুণ সে মাত্রায় পালিত মহায়ের থাকিলে, তিনি কোনো অংশে যে ঘোষ মহাশয়ের অপেক্ষা অল্প খ্যাতি পাইতেন, এমন মনে হয় না। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে এ সকল 'যদি'র স্থান নাই। তাঁহার নিরপেক্ষ বিচারে আমাদের প্রত্যেককে আমাদের উপযোগী শক্তিসাধ্য দান করিয়া থাকে। একদিকে কাহাকে একটু কিছু বেশি দিলে আর একদিকে একটু কাটিয়া ছাটিয়া সমান করিয়া দেয়। ঘোষ মহাশয়ের যাহা ছিল পালিত মহাশয়ের তাহা ছিল না, আর পালিত মহাশয়ের যাহা আছে,

ঘোষ মহাশয় তাহা পান নাই; এইরূপ গড়ে মানুষ একটা বিচিত্র ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের অনেক শক্তিসাধ্য আছে—যে সকল শক্তিসাধ্য থাকিলে লোকে ব্যবহারজীবী ব্যবসায়ে কৃতিত্ব লাভ করে, পালিত মহাশয়ের তাহা বিলক্ষণ ছিল। আর যে সুযোগ পাইলে এ সকল শক্তিসাধ্য সফলতা লাভ করিয়া থাকে, পালিত মহাশয়ের ভাগ্যে যে সুযোগও যে জুটে নাই, এমন বলা যায় না। কিন্তু তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহাতে এ সকল শক্তি এবং সুযোগ সত্ত্বেও তিনি আপনার ব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। লোকে সচরাচর ব্যবহার ব্যবসায়কে স্বাধীন ব্যবসায় বলিয়া থাকে বটে; কিন্তু এখানেও যে স্বাধীনতার খুব আদর থাকে বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব এমন বলা যায় না। উকিল ব্যারিষ্টারকে আদালতের মুখ চাহিয়া এবং হাকিমের মর্জ্জি বুঝিয়া চলিতে হয়। না পারিলে ব্যবসায় চলা ভার হইয়া উঠে। আর অনন্যসাধারণ আইন-জ্ঞান বা কর্ম্মকুশলতা গুণে ব্যবসায় চালাইতে পারিলেও সকল সময়ে সম-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করা সম্ভব হয় না। পালিত মহাশয় চিরদিন অতিশয় স্বাধীনচেতা লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লোকের মুখ চাহিয়া চলিবার কৌশলটী তিনি কখনও শিক্ষা করেন নাই। যে নম্রতা থাকিলে এ শিক্ষা সহজ হয়, পালিত মহাশয়ের প্রকৃতিতে তাহা নাই। খাতির কাহাকে বলে তিনি তাহা জানেন না। চক্ষুলজ্জা বস্তুটাও তাঁর আছে বলিয়া মনে হয় না। আর এ সকল যে উকীল ব্যারিষ্টারের নাই, তাঁর পক্ষে আপনার ব্যবসায়ে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা আদৌ সম্ভবে না। পালিত মহাশয়ের প্রকৃতি একটু রুক্ষ। মনে হয় যেন সহজেই তিনি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং—

মহাভারতের এই সমীচীন নীতি অনুসরণ করিয়া চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মোলায়েম করিয়া কথা বলার অভ্যাসটা তিনি কখনও লাভ করেন নাই। আর এই জন্য এত শক্তি সাধ্য থাকিতেও তিনি আপনার ব্যবসায়ে যথাযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

আর ঠিক এই কারণে দেশের তথাকথিত জনহিতকর কর্ম্মেও পালিত মহাশয় এ পর্য্যন্ত নেতৃ-পদ প্রাপ্ত হন নাই। এ আকাঙ্ক্ষাও যে তাঁর কখনও ছিল এরূপ মনে হয় না। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষ ভাগে, আর মনোমোহন ঘোষ মহাশয় আযৌবন দেশহিতকর অনুষ্ঠানে লিপ্ত ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ বাল্যাবধি লোকমত গঠন করিয়া আসিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে, যখন তিনি অজাতশ্মশ্রু যুবকমাত্র, তখন "ইণ্ডিয়ান মিরার" (Indian Mirror) পত্রের সম্পাদকীয় ভার বহন করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান মিরার" তখন সাপ্তাহিক ছিল; তার বহুকাল পরে দৈনিক আকারে পরিণত হয়। কিন্তু সে কালে একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনাও সামান্য ব্যাপার ছিল না। বিশেষতঃ "ইণ্ডিয়ান মিরার" তখন নবোদিত ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র ছিল। কেশবচন্দ্র বক্তৃতামঞ্চে যে সুর জাগাইতেছিলেন, ইণ্ডিয়ান মিরারের স্তম্ভে সেই সুরই ভাঁজিতে হইত। ইহাতে একদিকে মনোমোহনের শক্তিসাধ্যের ও অন্যদিকে লোক হিতব্রতে তাঁর কি যে গভীর অনুরাগ ছিল তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। মনোমোহন এইরূপে প্রথম যৌবনাবধি লোকনায়কের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চাভিলাষ আমরণ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। কিন্তু পালিত মহাশয়ের মধ্যে এ বস্তুটা কখনও দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। যে সকল সরঞ্জাম থাকিলে লোকে জন-নায়কের পদলাভ করিতে পারে, পালিত মহাশয়ের সে সকল সরঞ্জাম

কখনও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যেমন ব্যবহার ব্যবসায়ে হাকিমের মুখ চাহিয়া কথা বলিতে হয়, সেইরূপ জননেতৃত্ব লাভ করিতে হইলে অনেক সময় জনগণের মন যোগাইয়া চলা আবশ্যক হয়। যাঁহারা অনন্যসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি বা সাহিত্য প্রতিভার গুণে প্রথমে অগঠিত লোকমতকে প্রবুদ্ধ ও গঠিত করিয়া সেই সংহত জনশক্তির অগ্রণীরূপে লোকনায়কের পদ লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপভাবে লোকমতের অনুবর্ত্তিতা না করিয়াও সেই পদ রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের এ শক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে লোকমণ্ডলীর মুখাপেক্ষী হইয়া না চলিতে পারিলে, আধুনিক দেশহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রণীদলভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যাঁহারা লোকনেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন, একদিকে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ও অন্য দিকে কিয়ৎ পরিমাণে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর প্রায় সকলকেই স্বল্পবিস্তর লোকের মন যোগাইয়া চলিতে হইয়াছে। আর সুরেন্দ্রনাথও এক সময়ে যতটা স্বাধীন ছিলেন, পরে সে স্বাধীনতা ততটা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সকল গুণ থাকিলে লোকে এরূপ ভাবে পদ ও প্রতিপত্তির লোভে আপনাকে চাপিয়া রাখিতে পারে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়ের প্রকৃতিতে সে সকল গুণ নাই। যে স্বাধীন-চিন্তার জন্য তিনি আপনার ব্যবসায়ের চূড়ায় উঠিতে পারেন নাই, সেই স্বাধীন-চিন্তার জন্য তিনি আমাদের আধুনিক সমাজ সংস্কারের বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদলের নেতৃত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ কোনো আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে কখনও জাগিয়াছে কিনা সন্দেহ। অথচ পালিত মহাশয় নিজের পরিবারে আর দশজন বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুর মতন আধুনিক সমাজ-সংস্কারের আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু কখনও এ সকল লইয়া একটা হুজুগ করেন নাই। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আলোচনাতেও তিনি এইরূপেই যোগ দিয়া আসিয়াছেন;

প্রয়োজন মত কংগ্রেসের সাহায্যে যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁর সমশ্রেণীর আর দশজনে যেমন এ সকল ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, পালিত মহাশয়ও সেরূপ করিয়াছেন। কিন্তু কখনও এ সকল দানের জন্য কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিবার লিপ্সা তাঁর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

ফলতঃ এরূপ নেতৃত্বলাভের যোগ্যতাও তাঁর নাই; কিন্তু পালিত মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসার কথা এই যে, তিনি আপনার ঠিক ওজনটা জানেন। তিনি কি করিতে পারেন ও কি করিতে পারেন না, ইহা যেমন পরিষ্কাররূপে জানেন, তাঁর সমশ্রেণীর লোকেরা অনেকে তাহা জানেন না। এই জন্য যাহার যে কার্য্যের শক্তি ও সরঞ্জাম নাই, সেও পদের বা ধনের জোরে সে কার্য্যে কেবল হাত দেয় যে তাহা নহে, একেবারে নেতৃত্ব পদে যাইয়া চড়িয়া বসিতে চাহে। বাংলা ভাষায় ইহাকেই বোধ হয় হাম্বা বলে। এই বস্তু হইতে ইংরেজির হাম্বাগিজমের (Humbugism এর) উৎপত্তি হয়। যার প্রকৃতির ভিতরে এই বাংলা হাম্বা নাই, তার পক্ষে ইংরেজি হাম্বাগিজম করিবার কোনো প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। যার যে শক্তি নাই, সে সেই কাজ করিতে গেলে হাম্বাগ (Humbug) হইয়া উঠে। যার প্রকৃতিগত আস্তিক্য বুদ্ধি নাই যে যদি ধার্ম্মিকের আসনে যাইয়া বসিবার জন্য লালায়িত হয়; যার বাক্‌শক্তি নাই সে যদি করতালি লাভের লোভে বক্তৃতামঞ্চে যাইয়া দাঁড়াইতে চাহে; যার বিনয় স্বভাবসিদ্ধ নয় সে যদি বিনয়ীর যশোলিপ্সায় এই মহৎ গুণের অভিনয় করিতে ব্যস্ত হয়; যার বুদ্ধি ও বিদ্যা নাই, আছে কেবল ধনের উত্তাপ, সে যদি লোকমত পরিচালনার জন্য জননেতৃত্ব দাবী করিতে আরম্ভ করে;—তাহা হইলে তার পক্ষে এই হাম্বার জন্য হাম্বাগ্ না সাজা অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। পালিত মহাশয়ের মধ্যে এরূপ কোন হাম্বা

নাই বলিয়া, তিনি এই হুজুগের যুগেও এ পর্য্যন্ত হাঘাগ্ হইয়া উঠে নাই।

তাঁর রুক্ষ স্বভাবের জন্য পালিত মহাশয় নিজের ব্যবসায়ে যেমন অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ আমাদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনেও কোনও প্রকারের নেতৃত্ব মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। আর এই জন্য তাঁর মেধার বা চরিত্রের প্রভাব আমাদের শিক্ষিত সাম্প্রদায়ের মনোরাজ্যে কোনো প্রকারের আধিপত্য লাভ করে নাই। ফলতঃ ইংরাজিতে যাহাকে public man বলে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত সে জাতীয় জীব নহেন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে লোক-নেতৃত্ব লাভ করিবার কোনও উপকরণ নাই। অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে, আশৈশব তিনি অশেষ প্রভুত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ বলিয়া বহুকালাবধি জানা গিয়াছে। আর আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদিগের উপরে তাঁর একটা মোহিনী-শক্তিরও পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা পালিত মহাশয়ের সকল প্রকারের ত্রুটী দুর্ব্বলতা উপেক্ষা করিয়া চিরদিন তাঁর মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন। একবার যে তাঁহার বন্ধুতা লাভ করিয়াছে চিরদিন পালিত মহাশয় প্রাণপণে তাঁহার প্রতি সুহৃদ্জনোচিত সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছেন। অন্য পক্ষে তাঁহার শত্রুতা যে একবার করিয়াছে বা তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের কোনো প্রকারের অনিষ্টের চেষ্টাতে যে একবার লিপ্ত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত জীবনে কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা অল্প, শত্রুর সংখ্যা বেশী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শত্রু বা অসম্পর্কিত লোকের প্রতি পালিত মহাশয় কখনও উদার ও কোমল ব্যবহার করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রাণটা যে খুব

কঠোর এমন মনে করা সঙ্গত হইবে না। কারণ এই কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কোমল চিত্ততার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একদিকে যেমন পালিত মহাশয়কে নিরতিশয় কঠোর প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়, অন্যদিকে সময় সময় তাঁহার সেইরূপ অসাধারণ কোমলতারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের সম্বন্ধেই যে তিনি নিরতিশয় কোমল-চিত্ততার প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা নহে; কখনও কখনও নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত লোকদিগের প্রতি গভীর ও উচ্ছ্বসিত সহানুভূতিতে তাঁহার চক্ষে দরবিগলিত ধারা প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা স্বচক্ষে ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। সেই দিন একটী যুবকের করুণ প্রার্থনা শুনিয়া পালিত মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ আমাদের মধ্যে আর কাহারও সে জন্য অশ্রুপাত হয় নাই। পালিত মহাশয়ের আপাত কঠোরতা ও রুক্ষ স্বভাবের সঙ্গে সেই ভাবোচ্ছ্বাসের যতটা অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, ফলতঃ ততটা অসঙ্গতি এ দু'য়ের মধ্যে নাই। দুই-ই ভাবুকতার লক্ষণ। যাঁহারা অতি সহজে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তাঁহারা যে বস্তুতঃই অতিশয় নির্ম্মম প্রকৃতির লোক, তাহা নহে। প্রকৃত নির্ম্মম লোকেরা লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, কিন্তু হঠাৎ কাহারো উপরে চটিয়া যায় না। যাঁহাদের প্রাণ নিরতিশয় কোমল তাঁহারাই একদিকে সহজে ক্রোধের বশবর্ত্তী হন, আর অন্যদিকে স্নেহমমতার আবেগেও আত্মহারা হইয়া যান। এ বস্তুটী অনেক লোকহিতব্রত মহাপুরুষের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে ইহা দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর যেমন সহজে চটিয়া যাইতেন, সেইরূপ অতি সহজে আবার গলিয়া যাইতেন। ফলতঃ কোনও কোনও বিষয়ে পালিত মহাশয় বিদ্যাসাগর-চরিত্রকে স্মরণ করাইয়া থাকেন। অবশ্য দুজনাকে এক নিক্তিতে তৌল করা চলে না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেবত্ব পালিত মহাশয়ের মধ্যে সব দেখা যায় নাই; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানুষী ভাবগুলি অনেক সময় পালিত মহাশয়ের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ ছিলেন; পালিত মহাশয়ের স্বাধীন-চিত্ততাও লোকপ্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিতে পারিতেন না; পালিত মহাশয়ও তাহা পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল-চিত্ততাও কিয়ৎ পরিমাণে পালিত মহাশয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ব্রহ্মণ্যপ্রকৃতিসুলভ যে নিতান্ত নির্লোভ ভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটা বড় করিয়াছিল, রজত-প্রধান সভ্যতার আদর্শে অভিভূত, ব্যবহারজীবী পালিত মহাশয়ের মধ্যে সে নির্লোভ ও সে ত্যাগের প্রমাণ কেহ কখনও অন্বেষণ করিতে যায় নাই, কেহ কখনও পায়ও নাই আর শেষজীবনে পালিত মহাশয় যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী ত্যাগের সমজাতীয় বস্তু নহে। এ ত্যাগেও বিলাতী গন্ধ আছে, বিদ্যাসাগরের ত্যাগে সাত্ত্বিকতাপ্রধান ব্রাহ্মণ্য আভা দেখা যাইত। কিন্তু এ পার্থক্য সত্ত্বেও, বাংলার আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে উভয়েই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আর পালিত মহাশয় জীবনের সন্ধ্যাকালে এইরূপ ভাবে আপনার যথাসর্ব্বস্ব স্বদেশী যুবকগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য দান করিয়া, বাংলার আধুনিক সমাজের ইতিহাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একাসনে নহে, কিন্তু একই মন্দিরে, অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।



সাহিত্য সম্মেলন

যাঁহারা মনে করেন এই ক' বছরের স্বদেশী আন্দোলন ও আলোচনা একেবারে বিফলে গিয়াছে, তাঁরা আমাদের সাহিত্য সম্মেলনগুলিতে একবার উপস্থিত হইলে আপনাদের ভুলটা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

স্বদেশী কাহাকে বলে? কাপড় ও চিনি লইয়া যে স্বদেশী—তাহা বাহিরের ব্যাপার মাত্র। বিলাতী কাপড় জন্মে পরে নাই, বিদেশী চিনি জন্মে ছোঁয় নাই, এমন হাজার হাজার লোক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আছে। তাই বলিয়া কি তারা স্বদেশী?

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আলোচনা লইয়া যে স্বদেশী তাহাও বাহিরের কথা। এ সকল আন্দোলন আলোচনা এদেশে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কন্‌গ্রেসে বা কন্‌ফারেন্সে, কোথাও তো স্বদেশী বলিতে এই কয় বৎসরে আমরা যে বস্তুকে জানিয়াছি ও চিনিয়াছি, তার গন্ধও পাই নাই।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও এদেশে বহুদিন জাগিয়াছে। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এঁরা বহুদিন নানাভাবে, নানা রাগে, এই সুর ভাঁজিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহাদের এ সকল উদ্দীপনাতে "স্বদেশী"তো মিশিয়া থাকে নাই!

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়?

হেমচন্দ্র বহুদিন একথা বলিয়াছিলেন। আমরাও বহুদিন আগে

ধরিয়া, এ গান গাহিয়াছি ও তার মাদকতায় ভোর হইয়া কত না স্বপ্ন দেখিয়াছি, কত না খেলিয়াছি। কিন্তু স্বদেশী তো কখনও ছিলাম না। স্বাধীনতা তখন আমাদের বুদ্ধিতে কেবলমাত্র অনধীনতার নামান্তর ছিল। এই স্বাধীনতা বস্তু আমাদের নহে, অপরের। ইহা স্বদেশী নয়, বিদেশী। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সকলেই এক সময়ে এই স্বাধীনতার পুরোহিত ছিলেন। তাঁরা যে কাজ করিয়াছেন, তার দাম আছে, তার মর্য্যাদা আছে। সে জন্য বাংলা দেশ চিরকাল তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দান করিবে। কিন্তু অনধীনতা আর স্বদেশী এক নহে। স্বদেশী ভাবাত্মক বস্তু, অনধীনতা অভাবাত্মক। স্বদেশী আপনাকে পেতে চায়, অনধীনতা পরের হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইতে চায়।

আমরা বহুকাল ইংরেজের ও য়ুরোপের হাত হইতে আপনাদের ছাড়াইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলাম। কিন্তু ইংরেজের অনুকরণ ও য়ুরোপের অনুকরণ করিতে কখন ছাড়ি নাই। আমরা ইংরেজের গুণ লাভ করিয়া ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া, তার অধীনতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে আয়ত্ত করিয়া, য়ুরোপের নিজের অস্ত্রে য়ুরোপকে জয় করিব ভাবিয়াছিলাম। এ পক্ষে যে আমাদের নিজেদের "স্ব"কে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ জ্ঞান আমাদের তখনও জন্মায় নাই; এখনি যে সকলের জন্মিয়াছে, তাহা নহে। আমরা যে ইংরেজ নহি, আমরা ভারতবাসী, আমরা বাঙ্গালী; ইংরেজের মত হইলে আমরা আমাদের "স্ব"কে হারাইব; এই "স্ব"কে যদি হারাই তবে স্বাধীনতাও যে পরাধীনতা হইবে; কারণ "স্ব"ই যদি পর, যদি ইংরেজ বা য়ুরোপীয় হইয়া গেল, তবে স্বাধীনতা আর "স্ব"এর অধীনতা রহিল না, ইংরেজের বা য়ুরোপের অধীনতা হইয়া পড়িল। এ সকল কথা আমরা বহুকাল বুঝি নাই।

এ চতুরালী কাপুরুষতার প্রমাণ নহে, জীবনশক্তিরই লক্ষণ। জীবনসংগ্রামে যে একদিন এ জীব জয়লাভ করিবে, ইহা তাহারই নিদর্শন।

এই সাহিত্য সম্মেলনগুলিতে আমাদের সমাজে যে নূতন প্রাণ জাগিয়াছে, আর ইহা যে জীবন-সংগ্রামে একদিন জয়লাভ করিবেই করিবে, তাহার প্রমাণ পরিচয় পাইতেছি। স্বদেশীর রাষ্ট্রীয় আস্ফালনটা বর্জ্জন করিয়া সাহিত্য-সম্মেলন এসময়ে দেশের ভালই করিয়াছেন, মন্দ করেন নাই। নূতন জাতীয় জীবনে, নবপ্রবুদ্ধ জাতীয় শক্তি, নবোন্মেষিত স্বজাতিভক্তিটাকে বাঁচাইয়া রাখাই এখনকার প্রধান কর্ত্তব্য। আর এ শিশু যদি বসুদেব পুত্র বলিয়া পরিচিত না হইয়া, নন্দসুত বলিয়াই জগতে জাহির হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? বরং এই দিকেই সকলের চেষ্টা এবং আগ্রহ থাকাই তো বেশী আবশ্যক। রাষ্ট্রনীতি বর্জ্জন করাই তো এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য। ফলতঃ সাহিত্যের উদার রত্নবেদীতে বাগ্দেবীরই অধিষ্ঠান হয়, রণরঙ্গিনীর ভৈরবী-নৃত্যকলার অভিনয়ের স্থান তো এ নহে। রস সাহিত্যের প্রাণ; আর প্রেম রসের সেরা। সাহিত্য-সম্মিলন প্রেমের বাঁশীই বাজাইবে, বিরোধের ভেরী তো সেখানে বাজিতে পারে না। সাহিত্যের লক্ষ্য বিজ্ঞান। যে অর্থে বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলে, সাহিত্যের লক্ষ্য সেই বিজ্ঞান। যে বিশিষ্ট জ্ঞানেতে বহুত্বের মধ্যে একত্বের, ভেদের মধ্যে অভেদের প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্যের বিষয় সেই বিজ্ঞান বস্তু। সাহিত্যের লক্ষ্য সন্ধি ও সামঞ্জস্য; বিচ্ছেদ ও সংগ্রাম নহে। যে সাহিত্য জ্ঞানের, ভাবের, কর্ম্মের সর্ব্ব বিষয়ের আপাত ও আকস্মিক বিরোধ সকলকে, তাহাদের প্রকৃতিগত নিত্য মিলনের ভূমিতে তুলিয়া নিতে পারে না, সে সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয় না। আদর্শ সাহিত্যে মিলনের, সন্ধির, সামঞ্জস্যের সন্ধানেই সর্ব্বদা ফিরে। ইহাই তার স্বরূপ লক্ষণ। সুতরাং

দেশে যখন চারিদিকে একটা বিকট প্রলয়ঙ্কর বিদ্বেষ ও বিরোধ জাগিয়া লোকচিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, তখন বাংলার সাহিত্যিকগণ সাহিত্য সম্মিলনের এই মধুর মিলনক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিয়া দেশের কি যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

*   *   *   *

এবারে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনে যাইয়া এই মিলনের দৃশ্য দেখিয়া বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে আরো দু চারিবার চট্টলে গিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে একবার যাই—কিন্তু সকল দেশ তো ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিল না, সকলে ব্রাহ্মসমাজকে যে ভালবাসিতেন তাহাও নহে। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও সকলে এক সম্প্রদায়ের নহেন, কেহ সাধারণী, কেহ নববিধানী, সুতরাং তখন সমগ্র চট্টলের সম্মিলিত প্রাণবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি নাই। তার পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় দুই বার চট্টলে গিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও বিরোধের সুরই জাগিয়াছিল। হিন্দু একদিকে, মুসলমান একদিকে। "মডারেট" একদিকে, "একষ্ট্রীমিষ্ট" আর এক দিকে। সরকারী কর্ম্মচারীর দল এক দিকে, আর স্বদেশী সেবকমণ্ডলী আর এক দিকে। প্রাণের কথা যাহাই হউক না কেন,—আর সকলের প্রাণের কথাও যে এক ছিল, তাহাও বলা যায় না—কিন্তু বাহিরে, কাজকর্ম্মে, আলাপ আত্মীয়তায়, আদর অভ্যর্থনায় সকলকে পাই নাই। এবারে সাহিত্য সম্মিলনে সকলকে এক-ক্ষেত্রে, এক যজ্ঞে, এক ব্রতে, এক আরাধনায়, এক তপস্যায় সমবেত দেখিতে পাইলাম। একি কম কথা। "বয়কট" "স্বরাজ", "সংস্কার", "স্বাধীনতা" এ সকল দূরের কথা, বাহিরের কথা, ডালপালার কথা। গোড়ার কথাটা মিলন। মূল বিষয়টী—সমবেত হইয়া মাতৃসেবার অবসর ও আয়োজন। এক সাহিত্যক্ষেত্র ভিন্ন আর

কোথাও এরূপ সমবেত সাধনার অবসর নাই। কেবল আজিকালিই যে নাই, তাহা নহে; কোনো দিনই ছিল না। গবর্ণমেণ্ট সভাসমিতি বন্ধ করিয়া যে এ অবসর নষ্ট করিয়াছেন, তাহাও নহে; যখন সভা-সমিতি করিবার অবাধ অধিকার ছিল, তখনও বেসরকারী উকীল বা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একযোগে সরকারী কর্ম্মচারীগণ কোনো স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টা করিতে পারিতেন না। তাঁরা কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্সে যাইতে পারিতেন না। সাহিত্যে তাঁরাও সকলের সঙ্গে মিলিবার অবাধ অবসর পাইয়াছেন। এই জন্য পুরাতন স্বদেশী আন্দোলন অপেক্ষা একদিক দিয়া এই সাহিত্য সম্মেলনগুলিকে বেশী উপকারী বলিয়া মনে করি। এখানে একটা সার্ব্বজনীন মিলনভূমি গড়িয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মসংস্কারে সমাজসংস্কারে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে, কোথাও ইতিপূর্ব্বে যে মিলনমন্দির তুলিবার ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি নাই, এই সাহিত্য সম্মেলনে তাহাই গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া, কে না উৎসাহিত, কে না আনন্দিত হইবে?

সাহিত্য সম্মিলনী যেমন একটা বিশাল মিলনমন্দির গড়িয়া তুলিতেছে, সেইরূপ একটা উচ্চতর সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এখানে সকলে সমান, ছোট বড় ভেদ নাই। এখানে মতভেদ আছে, দলাদলি নাই। এখানে মর্য্যাদার দাবী কেবল এক—বিদ্যার; আর এ বিদ্যাও সেই বিদ্যা যাহা বিনয় দান করিয়া থাকে। এমন বিনয়ের ভাব, এদেশে কি বিদেশে, কোথাও কোনো সভাসমিতিতে কখনও দেখি নাই। যাদের বিনয়ের অভাব দেখা গিয়াছে তাহাদিগের আব্দার আস্ফালন সদস্যগণ আমোদ করিয়া, সহ্য করিয়াছেন; কখনও বিরক্তি সহকারে দমন করিতে যান নাই। কন্‌গ্রেস ও কন্‌ফারেন্সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্মটাই তো একরূপ কাটাইয়াছি; কিন্তু সেখানে যে টাকার উত্তাপ, পদের গুরুভার, নেতৃত্বের নির্য্যাতন প্রত্যক্ষ করিয়াছি;—

চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্মেলনে ধনী ও পদস্থ লোক অনেকে ছিলেন, সম্মিলনীর কর্ম্মক্ষেত্রে নেতৃত্বভার প্রাপ্ত পণ্ডিত লোকও ছিলেন, কিন্তু কাহারও মধ্যে সে সকল তমঃ ও অহঙ্কার দেখিতে পাই নাই। এবারে এখানে যাইয়া বুঝিলাম, এতদিনে দেশে সত্যই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে মৌলিক গবেষণার সঙ্গে প্রখর মেধা ও উভয়ের সঙ্গে অকৃত্রিম বিনয়ের সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছি। স্বদেশী মরিয়াছে, দেশের আর কোনও আশা ভরসা নাই বলিয়া যাঁরা হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, তাঁরা সাহিত্য সম্মেলনে যাইয়া একটীবার এই অভিনব উদ্দীপনা লাভ করিয়া আসুন, এই অনুরোধ করি।

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা

"বঙ্গদর্শনে" রবীন্দ্রনাথের একখানি চরিতালেখ্য লিখিয়াছিলাম। ইহাতে কোনো কোনো দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টিতে বস্তুতন্ত্রতার বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এই কথা বলি। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের আসন্ন ভক্তগণের কেহ কেহ বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমিও দুঃখিত হইয়াছি।

কারণ রবীন্দ্রনাথকে কোনো দিকে খাট করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য কবিপ্রতিভার দ্বারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে; আধুনিক বাংলা সাহিত্য কোনো কোনো দিকে বিশ্ব-সাহিত্যের সমাজে অতি উচ্চ স্থানে যাইয়া বসিবার অধিকার পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে খাট করিলে, ভারতীয় সাধনা ও বাঙ্গালী জাতিকে খাট করা হয়।

কিন্তু সত্যের দ্বারা কেহ যে কখনো খাট হয় বা হইতে পারে, অপরে যাই বলুন না কেন রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো এমন কথা বলিবেন না। আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি সর্ব্বদা যদি বস্তুতন্ত্র নাই হইয়া থাকে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো দোষের কথাও হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হইতেই সাহিত্য সৃষ্টিতে বস্তুতন্ত্রহীনতার উৎপত্তি হয়। কোনো কোনো দিকে যদি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হইয়া থাকে, তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কেহ কোনো মতে দায়ী করিবে না। তিনি যে স্থানে, যে কালে, যে পরিবারে জন্মিয়াছেন, যে সকল বাহিরের অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন, সে সকলই তার জন্য দায়ী। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়া এ সকল

অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। আর এ জগতে সর্ব্বত্রই ছায়াতপের ন্যায় ভাল ও মন্দ, পূর্ণ ও অপূর্ণ মিশিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বাহ্য ঘটনাপাতেও এ ভাল মন্দের মিশ্রণ রহিয়াছে। এ সকল ঘটনা ও অবস্থাতে কোনো কোনো দিক দিয়া তাঁর অলোক-সামান্য প্রতিভাকে যেমন কতকটা সংকুচিত করিয়াছে, আবার অন্য দিকে সে ক্ষতিপূরণ করিয়াই যেন, তাহাকে বাড়াইয়া এবং ফুটাইয়াও তুলিয়াছে। এ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষগুণেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির বস্তুতন্ত্রহীনতা এ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থারই ফল। ইহাতে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে যে খাট করিয়াছে বা করিতে পারে, এমন কথা বলা যায় না। বস্তুতন্ত্রহীনতা সৃষ্ট বস্তুকেই খাট করে, সৃষ্টিশক্তিকে খাট করে না, বরং কোনো কোনো দিক দিয়া বিচার করিলে, বাড়াইয়াই দেয় বলিয়া বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বস্তুতন্ত্রহীনতা তাঁর অলৌকিক কবি প্রতিভার অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক প্রভাবেরই সাক্ষ্য দেয়, তার শক্তিহীনতার প্রমাণ প্রদান করে না। বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়া কবি প্রতিভার কখনো যে কোনো অগৌরব হয়, এমন মনে করি নাই।

ফলতঃ "বস্তুতন্ত্র" কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আমার অঙ্কিত রবীন্দ্র-চরিত-চিত্র পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে "বস্তুতন্ত্র" কথাটা সংস্কৃত। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে ইহার বহুল ব্যবহার রহিয়াছে। ভগবান্ ভাষ্যকার শারীরক ভাষ্যে যখন-তখন এই কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন। আর আমাদের শাস্ত্রে বস্তুতন্ত্রতাবিহীনতার একটা অতি মামুলী দৃষ্টান্ত "বন্ধ্যাপুত্রবৎ।" মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটা এমন নিগূঢ়, এমন জটিল, এত বহুমুখী যে,

যে রমণী কখনো সন্তান ধারণ করেন নাই, তাঁর পক্ষে প্রকৃত মাতৃস্নেহ বস্তুটা যে কি তার জ্ঞানলাভ একেবারে অসম্ভব। ক্বচিৎ কোনো বন্ধ্যা অপরের সন্তানকে আপনার প্রাণের সমুদায় স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারেন, মায়ের চাইতে বেশি সন্তর্পণে ও একাগ্রতা সহকারে তার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন, কিন্তু সে স্নেহ যতই উদ্বেলিত ও অনাবিল, সে সেবা যতই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত হউক না, তাহা সন্তানবতীর আপনার সন্তানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধকে কিছুতে অধিকার বা উপলব্ধি করিতে পারে না। বাৎসল্য হিসাবে ইহা বস্তুতন্ত্র নয়। কিন্তু বস্তুতন্ত্র নয় বলিয়া ইহা যে কপট স্নেহ এমন কখনো বলা যায় না। আপন অধিকারে, নিজের স্বরূপে, এ বস্তু অতি সত্য ও খাঁটি। বস্তুতন্ত্র আর অকপট এক কথা নয়।

অতএব রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-বিষয়ক বা স্বাদেশিকতা-সম্বন্ধীয় অনেক কবিতা ঠিক বস্তুতন্ত্র নয়, একথা বলিলে রবীন্দ্রনাথ অধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্মের ভান করিয়াছেন বা স্বদেশভক্তি না থাকিলেও তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কিছুই বোঝায় না।

এমন কি ঠিক বস্তুতন্ত্র নয় বলিয়া কোনো ভাব বা রস যে একেবারে মিথ্যা হয়, এমনও নয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে প্রাণে যে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তাহা বস্তুতন্ত্র নয়। কিন্তু সর্প জ্ঞানটা মিথ্যা বলিয়া, এই ভ্রান্ত জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহা মিথ্যা, এমন কথা কেহ বলে না। তবে সত্য সর্প দর্শনে যে ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহা যেরূপ স্থায়িত্ব লাভ করে, রজ্জুতে সর্পভ্রমে যে ভয় জাগিয়া উঠে, তাহা সে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় না। বস্তুতন্ত্র রস বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া থাকে, বস্তুতন্ত্রতাহীন রস বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ মানস-কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়; যথাযোগ্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যখন আমাদের চিত্তে কোনো রসের সঞ্চার

হয়, তখন সে রসের বিকাশের ও পরিণতির একটা স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক ক্রমও প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে রস বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে না, কেবল মানস-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া জাগিয়া উঠে, তাহাতে এই সকল স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক বিকাশ-ক্রমটি দেখা যায় না। এই জন্য বস্তুতন্ত্রতাবিহীন রসকে ব্যভিচারী রস বলে। ব্যভিচারী রসের স্থায়িত্ব থাকে না। একটা রস ফুটিতে না ফুটিতে তার মধ্যে অপর বিপরীত রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর এই রসভঙ্গের দ্বারাই কোন্ রস ব্যভিচারী ও বস্তুতন্ত্রতাহীন এবং কোন্ রস অব্যভিচারী ও বস্তুতন্ত্র, ইহা অতি সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়।

সাহিত্যের বিষয় দুই শ্রেণীর। এক বাহিরের অবস্থা ও ব্যবস্থাদি, দ্বিতীয় অন্তরের অনুভূতি ও রসাদি। আর এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টিই সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে। যে কখনো সমুদ্র দেখে নাই, সে অপরের রচনায় সমুদ্রের যে সকল বর্ণনা পড়িয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনার কল্পনার সাহায্যে একটা সমুদ্রের ছবি যে আঁকিয়া তুলিতে পারে না, তাহা নয়। সেই অপার নীলাম্বুরাশি দেখিয়া মানুষের প্রাণে যে সকল ভাব আপনি জাগিয়া উঠে কল্পনাবলে যে সে ব্যক্তি সে সকল ভাবকেও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে না, এমনও নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার সমুদ্রের ছবি যে কল্পিত, সত্য নয়, অধ্যাস-প্রতিষ্ঠিত, বস্তুতন্ত্র নয়, এ কথা মানিতে হইবে। সকলে ইহার এই মায়িকতা ও বস্তুতন্ত্রহীনতা লক্ষ্য না করিতে পারে। যারা কখনো সমুদ্র দেখে নাই, তাদের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু যারা সমুদ্র স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহাদের নিকটে এই ছবিটী যে সাচ্চা নয়, কল্পনা ইহা ধরা পড়িবেই পড়িবে।

সেইরূপ যে সকল আন্তরিক রসের উপাদানে কোনো কাব্য সৃষ্ট হয়, তাহার বস্তুতন্ত্রতাও কবির অপরোক্ষ রসানুভূতির অপেক্ষা রাখে। এ অনুভূতি ব্যতীত যে এরূপ কাব্যসৃষ্টি হয় না, তাহা নয়। অনেক অবিবাহিত যুবক আপনাদের যৌবনসুলভ রস-প্রাচুর্য্য নিবন্ধন মাধুর্য্যের একটা মনগড়া ছবি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ এরূপ-ভাবে মাধুর্য্য রসের কল্পিত সম্ভোগ সর্ব্বত্র পূর্ব্বারাগের একটা অতি সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু এ সম্ভোগ যতই গভীর ও প্রাণোন্মাদকারী হউক না কেন, বস্তুতন্ত্র যে নয়, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য। আর বাসর ঘরে যুবদম্পতীর প্রথম মিলনে তাহাদের পরস্পরের দেহযষ্টিকে আশ্রয় করিয়া যে অশরীরী রস উথলিয়া উঠে, তার সঙ্গে পূর্ব্বরাগের এই কল্পিত সম্ভোগের প্রভেদ কোথায় এবং কি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতেই কেবল তাহা ধরা পড়ে। অনভিজ্ঞের পক্ষে ইহা বোঝা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি সাহিত্যের দুই রাজ্যকেই অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি বহিঃপ্রকৃতির ও স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির, সাহিত্যের বহিরঙ্গের এই উভয় প্রকৃতির বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আর মানব অন্তরের বহুবিধ রসের মনোহারিণী প্রতিমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কোনো কোনো বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অপরোক্ষ অনুভূতি আছে; কোনো কোনো বিষয়ে নাই। যেখানে তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেখানে এগুলি যেমন সুন্দর সেইরূপ সত্যোপেত এবং বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অপরোক্ষ অনুভূতি নাই, কিন্তু তিনি আপনার অলোক-সামান্য কবি-প্রতিভার অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার সাহায্যে যেগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেগুলি কোনো কোনো স্থলে অতিশয় প্রাণোন্মাদ-

কর হইলেও, সত্যোপেত এবং বস্তুতন্ত্র হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার আলোচনা করিতে যাইয়া, "বঙ্গদর্শনে", আমি এই কথাই বলিয়াছিলাম। এমন সোজা কথাটা যে রবীন্দ্রনাথের আসন্ন ভক্ত-সাহিত্যিকেরা বুঝিতে পারিবেন না, ইহা কল্পনা করি নাই।

সাহিত্যের সৃষ্টি সাহিত্যিকের অপরোক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, একেবারে শূন্যের উপরে গড়িয়া উঠে না। এই জন্য প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির একটা অতি ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকিবেই থাকিবে। সাহিত্যিকের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়া কোথাও তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মর্ম্ম ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির আলোচনা করিতে যাইয়া, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার অভিধানের সাহায্যে এগুলির অর্থ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এ সত্ত্বেও "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী আমার রবীন্দ্র-চরিতচিত্রের সমালোচনা করিতে যাইয়া, "আমি সাহিত্য সমালোচনার বিশুদ্ধ রীত্যনুসারে" এই চরিত-চিত্র লিখি নাই, এ অভিযোগ কেন করিয়াছেন, বুঝিলাম না। সাহিত্য যে জীবন ছাড়া নয়, এ কথা লেখক নিজেও স্বীকার করেন। তবে "সাহিত্য-রচয়িতার জীবনের ভাল মন্দের সহিত তাহার সাহিত্য-সৃষ্টির একান্ত সম্বন্ধ নাই,"—অজিত বাবু ইহা মনে করেন। অতএব কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টির সমালোচনা কালে এ ভাল-মন্দকে উপেক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক, নতুবা সে সমালোচনা ঠিক সাহিত্য-আলোচনার বিশুদ্ধ রীতি-সম্মত হয় না।

আমার নিকটে ভাল-মন্দটা বাহিরের বস্তু নয়, ভিতরের বিধান। প্রকৃতি ভেদে, অবস্থা ভেদে, অধিকার ভেদে ভাল-মন্দের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ও একই ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধরিয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে রমণীমুখ দর্শন কেন, স্ত্রীলোকের ছায়াস্পর্শ পর্য্যন্ত

অপরাধের কথা। কিন্তু যে চিত্রকর বা ভাস্কর চিত্রপটে বা মর্ম্মরখণ্ডে রমণী-রূপের অশরীরী মূর্ত্তিটী ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার ভিতর দিয়া মনুষ্য সমাজে "সুন্দরের" সংবাদ প্রচার করিবেন, তাঁর পক্ষে জীবন্ত রূপসীকে সম্মুখে রাখিয়া, তার মুখ ধ্যান করিতে করিতে, সে রূপে তন্ময় হইবার জন্য সর্ব্বপ্রকারের সাধন অবলম্বন না করা অধর্ম্ম। খৃষ্টিয় জগতের ধর্ম্মনীতিও এখন প্রাচীন ইহুদার দশাজ্ঞার মাপকাটিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক য়ুরোপের ধর্ম্মনীতি বা এথিকস্‌ ও (Ethics ও) এখন আত্মচরিতার্থতা লাভ বা self-realisation কে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ভাল মন্দ বিচারের একমাত্র কষ্টিপাথর বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। ভারতের সনাতন সাধনা "ধর্ম্ম" বলিতে চিরদিন একরূপ এই বস্তুকে বুঝিয়া আসিয়াছে। এই জন্যই ধর্ম্মকে "সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ" বলা হইয়াছে। আমাদের সাধনা প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিয়া, সেই প্রকৃতির পরম পরিণতি ও চরম চরিতার্থতা লাভকে ধর্ম্ম বলিয়া চিরদিন প্রচার করিয়াছে। সুতরাং কবির পক্ষে আপনার কবি-প্রকৃতির পরম পরিণতি ও চরম চরিতার্থলাভই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম। কোনও কাব্যসৃষ্টি এই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে কি না করিয়াছে, ইহারই দ্বারা তাহার ভালমন্দের বিচার হইবে। এই কষ্টি পাথরেই আমিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দশ-আজ্ঞার ফুট-ফিতা ফেলিয়া তাঁর "জীবনের ভাল-মন্দের" কালি কষিতে যাই নাই।

কিন্তু বাহিরের ধর্ম্মাধর্ম্মের মাপকাটি দিয়া কবির জীবনের বা কাব্য-সৃষ্টির বিচার করা অসঙ্গত বলিয়া তিনি জটিল মানব-জীবনের কোন্‌ বিভাগের কতটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, আর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি কোথায় কি পরিমাণে এই সকল অপরোক্ষ অনুভূতির ফল, এবং কোথায় কি পরিমাণে কেবল আপনার মানস-কল্পনার সৃষ্টি, তারও বিচার করা

কি "সাহিত্য-সমালোচনার-বিশুদ্ধ-রীতি"-সম্মত নহে? অজিত বাবু শেলির দুইটী চরণ উদ্ধার করিয়াছেন:—

In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought

এই idol of my thought, এই মানস-প্রতিমা কি শেলির অন্তরে আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, না যে সকল মর্ত্ত্য-দেহের সঙ্গে তিনি বিবিধভাবে বিবিধ রসের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বরাঙ্গিনীদের বরবপুকে আশ্রয় করিয়া তাঁর চিত্তে এই মানস-প্রতিমার আবির্ভাব হইয়াছিল? যে ভাবে শেলি এই সকল মর্ত্ত্যদেহে তাঁর অমূর্ত্ত মানস-প্রতিমাকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা হয় ত খৃষ্টিয় সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম নীতির অনুমোদিত ছিল না। সুতরাং এই নীতির দিক দিয়া বিচার করিলে, শেলির চরিত্র নিন্দনীয় হইতেও বা পারে। কিন্তু শেলির কাব্যের আলোচনায় সমাজনীতির এই সিদ্ধান্তের কোনো স্থান নাই। এখানে শেলি যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন, রসের ওজনে তাহা সত্য ও সুন্দর কি না, ইহাই বিচার করিতে হইবে। আজন্ম ব্রহ্মচারী কার্ডিন্যাল্ নিউম্যান (Cardinal Newman) যদি এই কবিতাটী লিখিতেন, আর শেলি যদি কার্ডিন্যাল্ নিউম্যানের—

"Lead Kindly Light"

এই বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতটী রচনা করিতেন, তবে এ দুটীকেই কি বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলা যাইত না? ভগবান শঙ্করাচার্য্য যদি অলৌকিক কল্পনা বলে কালিদাসের উমার রূপবর্ণনাটী লিখিতেন, আর কালিদাস যদি শঙ্করের 'মোহমুদ্গর' রচনা করিতেন, তবে এ সকলকে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও অপরোক্ষ রসানুভূতির কষ্টিপাথর দিয়া বিচার করিয়া, ইহাদের সত্যাসত্য ও ভালমন্দ নির্দ্ধারণ করা কি "সাহিত্য সমালোচনার বিশুদ্ধ রীতি"-সম্মত হইত না?

দাঁতের বিয়েট্রিস্, চণ্ডিদাসের রজকিনী রামা, বিদ্যাপতির লক্ষ্মীবাই— না থাকিলে কি কখনো ইহারা আপনাদের কাব্যসৃষ্টিতে এমন অদ্ভুত রস ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন? সে অবস্থায় তাঁহাদের এই সকল অনুপম কাব্যসৃষ্টিও যে বন্ধ্যাপুত্রবৎ বস্তুতন্ত্রতাবিহীন হইয়া পড়িত, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। ওয়াল্ট হুইটম্যান্ খৃষ্টীয়ান্ সমাজে জন্মিয়া, তাহার অঙ্কে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে তিনি যে অদ্ভুত রসের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে খৃষ্টীয়ানী সাধনার সঙ্গতি নাই। এই আদর্শ পুরামাত্রায় প্যাগান (Pagan), খৃষ্টীয়ান নহে। রক্তমাংসের ভিতর দিয়া বিধাতা যে অপরূপ রূপ ফুটাইয়া তুলেন, প্রাচীন গ্রীস ও রোমই কেবল তাহাতে কোনো প্রকারের অতিলৌকিক অরূপকতা বা আধ্যাত্মিকতা আরোপ না করিয়া, রক্তমাংসের বলিয়া রক্তমাংসরূপেই এই মানুষী সৌন্দর্য্যের সাধনা করিয়াছিল। ইহাই প্যাগান রূপ-সাধনা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ওয়াল্ট হুইটম্যান এই সাধনাকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সাহায্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অদ্ভুত কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে হুইটম্যানের প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-ভোগ-চেষ্টার সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, এই অতি মোটা কথাটা না বুঝিলে, হুইটম্যানকে কেহ বুঝিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। হুইটম্যান প্রথম যৌবনে ব্রহ্মচারী বা পরজীবনে ব্রাহ্ম হইলে যে তাঁর অপূর্ব্ব কাব্যসকল রচনা করিতে পারিতেন না, ইহা বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

বাহিরের বিষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অপরোক্ষ রসানুভূতির সঙ্গে কবির কাব্যসৃষ্টির সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সেখানেই এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে আপনার কবিকল্পনাকে

গড়িয়া তুলিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁর কাব্যসৃষ্টি অলৌকিক উৎকর্ষ ও সত্য লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁর "পতিতা" শীর্ষক কবিতাটীর উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই কবিতাটীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, এমন কবিতা জগতের কোনো সাহিত্যে আছে কি না, জানি না। শুনিয়াছি ব্রাউনিংএর রচনার কোনো কোনো স্থলে নাকি ইহার আভাসমাত্র পাওয়া যায়। আর রবীন্দ্রনাথ যে এমন অনুপম বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, কারণ তিনি হিন্দু, খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান নহেন। রবীন্দ্রনাথের মনগড়া তত্ত্বসিদ্ধান্ত যাই হউক না কেন, জীবের ভিতরেই যে অক্ষয় শিবস্বরূপ বাস করিতেছেন, তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এই ধারণা সর্ব্বদা জাগিয়া আছে। "পতিতা" লোকচক্ষে "পতিতা", সমাজে পরিত্যক্তা, অনার্য্যসেবিতা হইলেও, ভাগবতী-প্রকৃতির বিগ্রহ বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে সে দেবতা, তার এই দেবভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত, পাতিত্য-কর্ম্মের পাপকলুষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে মাত্র,—শুভ যোগাযোগে যে সে অন্তর্নিহিত দেবতা সেই পতিতার মধ্যেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন,—এ বিশ্বাস কেবল হিন্দুর আছে। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর পুরাণ, হিন্দুর তন্ত্র, এমন কি হিন্দুর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্ম পর্য্যন্ত—সকলে মিলিয়া অলক্ষিতে এই ভাবটী জাগাইয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু না হইলে, "পতিতার" অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রূপরাশিকে এমন ভাবে ভক্ত অবনত প্রাণে কখনো ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না।

কিন্তু কেবল "পতিতার" চিত্রাঙ্কনেই যে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে অপূর্ব্ব বস্তুতন্ত্রতার সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থে 'নারী' শীর্ষক প্রায় সকল কবিতাগুলিতেই সত্য ও সৌন্দর্য্যের এই মধুর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'উর্ব্বশী' রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি।

জগতের আর কোনো সাহিত্যে 'উর্ব্বশীর' মত কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ উর্ব্বশী হিন্দুর নিজস্ব বস্তু। ভিনাসের মত রূপসী হইয়াও উর্ব্বশী ভিনাস নহেন। আধুনিক সাহিত্য-সৃষ্টিতে রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী'তে (She তে) আমাদের 'উর্ব্বশীর' ছায়ার ছায়া একটু ফুটিয়াছে মাত্র বলিয়া মনে হয়। হ্যাগার্ড এই 'শী'কে (She কে) পরবর্ত্তী উপন্যাসে *World's Desire*—'বিশ্ববাসনা' রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু

………..বিকশিত বিশ্ব-বাসনার

অরবিন্দ মাঝখানে . ……..

রবীন্দ্রনাথ যে 'উর্ব্বশীকে' প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তার সঙ্গে হ্যাগার্ডের "শী"র (She-র) কোনো তুলনা হয় না। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিকুশলতা "উর্ব্বশী"তে যেমন ফুটিয়াছে, তাঁর আর কোনো কবিতায়, বোধ হয়, তেমন ফোটে নাই। এই সৃষ্টিকুশলতা জগতের অমর কবি-সামাজেও বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, কেবল তাঁর অদ্ভুত শব্দসম্পদকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠে,—এগুলির সৌন্দর্য্য একান্ত ধ্বন্যাত্মক, অশরীরী, স্বপ্নদৃষ্টির ন্যায় এগুলি ছায়াময়ী। এই সকল কবিতায় অতৃপ্ত বাসনার জ্বলন্ত পিপাসা মাত্র বাড়াইয়া দেয়, কোনো বিষয়ে সত্য ও পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে পারে না। "উর্ব্বশীর" মাধুর্য্য এ জাতীয় নহে। অথচ "উর্ব্বশী" সত্য সত্যই—

"অখিল মানস-স্বর্গে অন্তর রঙ্গিনী"

"স্বপ্ন-সঙ্গিনী" ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু "বিশ্ববাসনার" এই স্বপ্ন যে সত্য, বাস্তবজীবনের সকল সত্য অপেক্ষা কম সত্য নহে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বেশী সত্য, রবীন্দ্রনাথ আপনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কুশলতাগুণে, "উর্ব্বশীর" চিত্রে এই তত্ত্বটী বিশদ করিয়া ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন। বস্তুতন্ত্র কাব্য কাহাকে বলে, "উর্ব্বশীতে" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহা দেখাইয়াছেন; বিশিষ্টের মধ্যে যে নির্ব্বিশেষ বস্তু আত্মগোপন করিতে যাইয়া নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, সান্তের মধ্যে যে অনন্ত আপনাকে হারাইবার চেষ্টা করিয়া পূর্ণতর স্ফুটতররূপে আপনাকে ফিরিয়া পাইতেছেন; অনিত্যের চাঞ্চল্যের মধ্যে যে নিত্যত্বের নিত্যস্বরূপটী স্থির হইয়া "নির্ব্বাতনিষ্কম্পমিব-প্রদীপম্" জ্বলিতেছে,—রবীন্দ্রনাথ সমষ্টিগত মানবহৃদয়ের অতৃপ্ত-অনন্ত-রূপপিয়াসার চিরন্তন-বিষয়রূপিণী "উর্ব্বশীর" চিত্রে তাহা দেখাইয়াছেন। এখানে অন্য-কামনা-শূন্য কাম, সর্ব্বসম্পর্কবিহীনা কামিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্যান করিতেছে। এখানে রমণী শুদ্ধ রমণীরূপে আপনার নিত্য ও নিজস্ব স্বরূপটীতে পুরুষের শুদ্ধ পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত। এখানে পতঙ্গ অগ্নির মধ্যে নিজ স্বরূপের সাক্ষাৎকার পাইয়া আত্মহারা। জগতের সকল কবিই কোনো না কোনো ভাবে, রমণী রূপের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "উর্ব্বশীর" চিত্রে ও রূপটী যেমন করিয়া ধরিয়াছেন, সেক্সপীয়র কি শেলী, বায়রণ কি ব্রাউনিং, হাফেজ কি সাদি,—অথবা আমাদের কালিদাস বা ভবভূতি, জয়দেব বা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস বা আর কেহ তেমন করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" শ্রেষ্ঠতম কাব্য ও গভীরতম দর্শন।

"উর্ব্বশীতে" যাহা কবি অপূর্ব্ব কলাকুশলতা সহকারে সূত্ররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, "নারী" শীর্ষক ভিন্ন ভিন্ন কবিতাগুলিতে তাহাকেই যেন বৃত্তির আকারে বিশদ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক দিকে আপনার চারি পাশের নিসর্গের ও মানব-সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অন্য দিকে আপনার অন্তরের নিগূঢ়তম অপরোক্ষ রসানুভূতি—এই দ্বিবিধ সত্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন কবি তাঁর অপূর্ব্ব "উর্ব্বশীকে" সেইরূপ এই

"নারী" শীর্ষক অনেক চিত্র ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং এইজন্য তাঁর "উর্ব্বশী" যেমন গভীর বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ তাঁর "তোমরা ও আমরা", "ব্যক্ত প্রেম", "লজ্জিতা" এই সকলগুলিই অনুপম সৌন্দর্য্য ও বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। ফলতঃ নারী হৃদয়ের গভীরতা ও রমণী চরিত্রের দুর্ভেদ্য বিচিত্র রহস্য রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া নানাদিক দিয়া, নানাভাবে ও বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, আর কোনো বাঙ্গালী কবি তাহা করিতে পারেন নাই। আর রবীন্দ্রনাথ যে কালে, যে দেশে, যে পরিবারে, যে সমাজে অসাধারণ রূপগুণে বিভূষিত হইয়া জন্মিয়াছেন এবং যে সকল বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জীবনের সমুদায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁর নারী-চিত্রগুলি এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সত্য লাভ করিয়াছে।

(২)

পূর্বে "বিজয়ায়" রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির বস্তুতন্ত্রতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কোন্ কোন্ স্থলে তাঁর কবিতা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনন্যসাধারণ সত্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সকল কাব্য-সৃষ্টিই যে বস্তুতন্ত্র, এমন বলা যায় না।

কবিকল্পনা ও বস্তুতন্ত্রতা

কিন্তু এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বস্তুতন্ত্রতা সম্বন্ধে আরো দুই চারিটী কথা বলা প্রয়োজন। বস্তুতন্ত্রতা কা'কে বলে, পূর্ব্ব প্রবন্ধে

তাহা যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সে সকল কথা এ পর্য্যন্ত কেহ অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু কেহ কেহ আর একটা কথা তুলিয়াছেন। তাঁরা বলেন, বস্তুতন্ত্র না হইলে যদি সাহিত্য-সৃষ্টি শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষ লাভ করিতে না পারে, তবে কবিকল্পনা বলিয়া লোকে যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, কাব্যজগতে তার স্থান ও মান রহিল কৈ ?

প্রাকৃতজনে যে বস্তুটী যেমন আছে, ঠিক তেমনি দেখে। প্রাকৃতজনের জ্ঞান ও সেই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের অন্তরে হাস্যোদ্ভুতকরুণরুদ্রাদি যে রস যখন ফুটিয়া উঠে, তাহা সর্ব্বদাই এই জন্য একান্ত বস্তুতন্ত্র হয়। কিন্তু কবি সেই বস্তুর মধ্যেই এমন কিছু দেখেন যাহা প্রাকৃতজনের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কবি সেই অজ্ঞাত, অশরীরী বস্তুকেই নামরূপ দিয়া লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানেই কবিপ্রতিভার বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব। কবির জ্ঞান ও রস যদি প্রাকৃতজনের জ্ঞান ও রসের মতন বস্তুর অধীন হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা কাব্যরস সৃষ্টি কিছুতে সম্ভব হয় না। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতা কাব্য-সৃষ্টির গুণ হওয়া দূরের কথা, তাহার মূল পর্য্যন্ত কাটিয়া দেয়।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইঁহাদের মনোভাবটা ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়। ফটোগ্রাফ যে নিতান্তই বস্তুতন্ত্র, এ বিষয়ে তো আর কোনো গোল নাই। কিন্তু কোনও বনস্থলীর বা জনবিশেষের তৈলচিত্র আর তাহার ফটোগ্রাফ যে এক বস্তু নহে ইহাও তো সকলে স্বীকার করিবেন। একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফারে এবং একজন সুনিপুণ তৈলচিত্রকরে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। ফটোগ্রাফে এবং চিত্রশিল্পে পার্থক্য বিস্তর। একেতে বাস্তবতা বা বস্তুতন্ত্রতা সুপ্রতিষ্ঠিত। ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় যে বস্তুটী ঠিক যেমন ভাবে থাকে, ফটোগ্রাফ হুবহু ঠিক সেই ভাবে

তার ছবিটী তুলিয়া লয়। কিন্তু তৈলচিত্রে তার চাইতে বিস্তর বেশি করে। ফটোগ্রাফ পার্থিব আলোকে ফুটিয়া উঠে। তৈলচিত্র মানসিক আদর্শের অপ্রত্যক্ষ কিরণমণ্ডিত হইয়া বস্তুর ভিতরকার সত্য ও সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলে। একেতে ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারের সাক্ষ্য দেয়, অপরে মানস সাক্ষাৎকারের প্রমাণ প্রদান করে। একেতে বাস্তবতা প্রবল, অপরে কল্পনার প্রভাব প্রত্যক্ষ। এই কল্পনাই ললিত কলার প্রাণ। আর বাস্তবতা ও কল্পনা এক বস্তু নহে। ইহারা বস্তুতঃ একে অন্যের বিরোধী পর্য্যায়ভুক্ত। যাহা বাস্তব তাহাকে কল্পিত নয় বলিয়াই আমরা জানি ও বুঝি। যাহা কল্পিত তাহা বাস্তব নয়, মানুষের ভাব ও ভাষা ইহাই প্রতিষ্ঠিত করে। আর তাহাই যদি হয় তবে বস্তুতন্ত্রতা কেমন করিয়া কাব্যের বা চিত্রকলার, স্থাপত্যের বা ভাস্কর্য্যের একটা প্রধান ও মৌলিক লক্ষণ হইবে? কেহ কেহ এই কথাটা এখনও বুঝিয়া উঠেন নাই।

এই প্রশ্নের অন্তরালে দুইটি ভ্রান্তি লুকাইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ বস্তুতন্ত্রতার অর্থ সম্বন্ধে একটু গোল আছে; দ্বিতীয়তঃ কবি-কল্পনার লক্ষণ সম্বন্ধেও বোধ হয় পরিষ্কার ধারণা এখানে নাই।

মনোবিজ্ঞানের সাক্ষ্য

জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন। বস্তুসাক্ষাৎকার ব্যতীত কোনও জ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব, সকল মনোবিজ্ঞানেই এই কথা স্বীকার করে। কিন্তু জ্ঞান যে বস্তুর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই জ্ঞানমাত্রেই যে বস্তুর অধীন, একথা সত্য হইলেও, জ্ঞানের এই বস্তুতন্ত্রতা বা বস্তুর অধীনতা ফলতঃ আংশিক মাত্র, পূর্ণ নহে। বস্তুসাক্ষাৎকার ব্যতীত বস্তুজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যে জ্ঞান প্রথমে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া জন্মে, সেই জ্ঞান আবার জন্মিতে না জন্মিতে সেই বস্তুকে ছাড়াইয়া, তার অনেক উপরে ও অতীতে চলিয়া যায়; ইহাও অস্বীকার

করা অসম্ভব। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইতে পারা যায়। যে কখনও গরু দেখে নাই, তার কোনো ক্রমে গো-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু এই ব্যক্তি যখন জীবনে সর্ব্বপ্রথমে একটা গরু দেখিল, তখন যেমন গো-বস্তুর জ্ঞান তার জন্মিল, সেইরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে এই গরু ভাল কি মন্দ, বিচারও সে করিয়া বসিল। যতক্ষণ এই ভাল মন্দ-বিচার না জন্মিয়াছে, ততক্ষণ তার গো-বস্তুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি মাত্র জন্মিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত গো-জ্ঞান জন্মে না ও জন্মিতে পারে না। কারণ জ্ঞান মাত্রেই বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিচার মাত্রেই তুলনা সাপেক্ষ। আর এই তুলনা করিতে যাইয়া আমাদের জ্ঞান সর্ব্বদা তার প্রত্যক্ষ জ্ঞেয় বস্তুর মূল আদর্শকে যাইয়া আশ্রয় করে। ঐ আদর্শের আলোকে তাহার ভাল মন্দাদির পরখ করিয়া লয়। এই আদর্শটী বস্তুর মধ্যে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে নিঃশেষিত হয় না। এই আদর্শ প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব স্বরূপ। আমরা বাহিরে, বস্তুবিশেষের যে দিক্‌টা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়,—তার মধ্যে সেই বস্তুর রূপের সাক্ষাৎকার পাই, স্বরূপের সাক্ষাৎকার পাই না। স্বরূপ রূপের উপরে। স্বরূপের দ্বারাই বস্তুর ওজন ও বিচার হয়। বেদান্ত যাহাকে নাম-ও-রূপ বলেন, সেই নাম-ও-রূপই—"অনির্ব্বচনীয়ে, অব্যাকৃতে ব্যাচিকির্ষীতে"—প্রত্যেক বিশিষ্ট পদার্থের আদর্শ, ছাঁচ, স্ফুট, স্বরূপ। এই স্বরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না। প্রাকৃতজনে বস্তুর রূপ দেখে, সেই রূপের ভিতরে তার স্বরূপের সামান্য সঙ্কেত ও আভাস পায় মাত্র। কিন্তু প্রকৃত কবি-প্রতিভা বস্তুর এই স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে। বস্তুর যে রূপ ও রস বাহিরে ফুটিয়া উঠে নাই, আর সেই জন্য যাহা প্রাকৃতজনের জ্ঞানগোচর হয় নাই, অলৌকিক প্রতিভাশালী কবি তাহারও দর্শন ও আস্বাদন পাইয়া থাকেন। ইহাই কবি-কল্পনার বিশেষ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কিন্তু এই কবি-কল্পনা অবস্তুকে আশ্রয় করিয়া ফুটে না,

একশ' তের

বস্তু সাক্ষাৎকারের উপরেই তাহা ফুটিয়া উঠে। বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তাহা জাগে, অথচ সর্ব্বথা আবার সেই বস্তুকে ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু ছাড়াইয়াও অন্য বস্তুতে বা অবস্তুতে যায় না, বস্তুর রূপকে ছাড়াইয়া তার স্বরূপে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং এই রূপের উপরে বিবিধ রসের রং ফুটাইয়া, তাহার মধ্যে সেই স্বরূপকে জাগাইয়া ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলে। এই জন্য কবি-কল্পনা অলীক, অবস্তু নহে। তাহাও সত্য, বরং প্রাকৃতজনের এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য অপেক্ষা সত্য। কবি-কল্পনার প্রামাণ্য বেশী, কম নহে। তবে এই কবি কল্পনার সত্যাসত্য তার বস্তুতন্ত্রতার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, অন্য কোনো কিছুর দ্বারা হয় না। যে কবিকল্পনা বস্তুর স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভে পটু, তাহাই শ্রেষ্ঠ। আর এই স্বরূপ কুত্রাপি বস্তুর রূপকে ছাড়িয়া থাকে না; সেই রূপের মধ্যেই আপনাকে লুকাইয়া রাখে। সুতরাং যে কবি-কল্পনা বস্তুর এই রূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই রূপের ভিতরে তার স্বরূপকেও প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ যাহা মূলে বস্তুসাক্ষৎকারে জাগিয়া উঠে বলিয়া বস্তুতন্ত্র হইয়া থাকে, অথচ আবার সেই বস্তুর বাহিরের রূপাদিকে ছাড়াইয়া তার স্বরূপে যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, সেই কবিকল্পনা সত্য, সেই কবিকল্পনা শ্রেষ্ঠ। বন্ধ্যাপুত্রবৎ, আকাশ-কুসুমবৎ তাহা অলীক ও মায়িক হয় না।

যে শিল্পী বস্তুর এই রূপের ভিতর দিয়া তার স্বরূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তাঁর কল্পনা সত্য। যিনি যে পরিমাণে আপনার কাব্যে বা চিত্রে বা স্থাপত্যে বা ভাস্কর্যে, বাদ্যে বা সংগীতে বস্তু-বিশেষের বা রসবিশেষের আকস্মিক ও উপচয়-অপচয়শীল রূপের মধ্যে তার নিত্য ও চিরন্তন স্বরূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে আপনার সৃষ্টিতে যুগপৎ সত্য ও সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন। লোকের ছবি তো অনেকেই তুলে। কেহ ক্যামেরার সাহায্যে তুলে।

কেহ তুলিকা ও রংএর সাহায্যে তুলে। কিন্তু যে চিত্রকর আপনার চিত্রফলকে কোনও লোকের সত্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বটি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ জনচিত্রকর বা portrait painter। দৈনন্দিন কর্ম্মের ব্যবস্থা ও বিক্ষেপ-বিরোধের মধ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের মনের ভাব ও তার সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা ও শরীরের ভঙ্গী বা pose পরিবর্তিত হইতেছে। ফটোগ্রাফার ভিন্ন ভিন্ন প্লেটে এই বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গীর এক একটা ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। কিন্তু এই অসংখ্য ভাব ও ভঙ্গীর ভিতরে আমাদের জীবনের ও চরিত্রের যে একটা একত্ব ও ব্যক্তিত্ব লুকাইয়া আছে, সে বস্তুকে ফটোগ্রাফে ধরা কঠিন। তৈলচিত্রাদিতে তাহা ব্যক্ত হয়। না হইলে সে চিত্র সত্য ও শ্রেষ্ঠ হয় না; হইতে পারে না। সুনিপুণ তৈলচিত্রকর আপনার দৈবী কল্পনার বলে আমার এই একত্ব, এই ব্যক্তিত্ব, এই মূল স্বরূপটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া ফুটাইয়া তুলেন। প্রাকৃত জনে ইহা পারে না কারণ তাহাদের এই স্বরূপ-দৃষ্টি এখনও খোলে নাই। এই স্বরূপ-দৃষ্টিই কবিকল্পনার প্রধান লক্ষণ। আর এই স্বরূপ-দৃষ্টিগুণে কবি সকল বস্তুর মধ্যে সে বস্তুর অতীতে ও অন্তরালে যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য, যে শক্তি ও যে শিক্ষা রহিয়াছে তাহাকে দেখিয়া, নামরূপের মধ্যে সেই অদৃষ্ট অতীন্দ্রিয় বস্তুকে আবদ্ধ করিয়া, দৃষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদির দ্বারা তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলেন। কিন্তু তিনি যত বেশী দেখুন না কেন, তাঁর জ্ঞান ও রস উভয়ই বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া জন্মিতে ও উৎসারিত হইতে পারে না। ফলতঃ নিরতিশয় মিথ্যা ও উদ্দাম কল্পনাও একেবারে শূন্যে বিহার করে না। আকাশকুসুমও প্রত্যক্ষ আকাশ ও প্রত্যক্ষ কুসুম—এই দুই প্রত্যক্ষের উপরে কল্পিত হয়। তবে যে ইহাকে অলীক বলি, তাহা কেবল এই জন্য যে আকাশকুসুম বস্তুতে আকাশের সঙ্গে কুসুমের যে সম্বন্ধটা বাঁধিবার চেষ্টা হইয়াছে, সে সম্বন্ধটা দুনিয়ার

কোথাও নাই, সে সম্বন্ধকে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কল্পনার অলীকতা ও মায়িকতা এই অঘটন-সংঘটিত সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে বস্তুর সঙ্গে যে বস্তুর যে সম্বন্ধ কখনও কাহারও সাক্ষাৎকার হয় নাই, হওয়া অসম্ভব ও অসাধ্য, সে সকল বস্তুর মধ্যে কবিকল্পনা যেখানে সেই অভূত ও অভবিতব্য সম্বন্ধের সৃষ্টি করে, সেইখানে তাহা বস্তুতন্ত্রহীন এবং অসত্য হইয়া যায়। বন্ধ্যার পুত্রশোক ইহার আর একটা দৃষ্টান্ত। বন্ধ্যাও সত্য, পুত্রশোকও সত্য। কিন্তু বন্ধ্যার পুত্রশোক হয় না,—হইতে পারে না; সন্তানবতীর তাহা হয়, হইতে পারে। এইজন্য বন্ধ্যার পুত্রশোকে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তার সাক্ষাৎকার অভূত এবং অভবিতব্য। আর এই কারণে বন্ধ্যার পুত্রশোক মিথ্যা, অসাধু কল্পনা। ইহা অলীক, বস্তুতন্ত্র নহে।

প্রাকৃত জনের জ্ঞান এবং কবি-কল্পনার সৃষ্টি

অতএব কবিকল্পনাও বস্তুতন্ত্র হইবে, একথা বলিলে প্রাকৃতজনের জ্ঞানের ও ভাবের সঙ্গে কবিজনের জ্ঞান ও ভাবের কোনো প্রভেদ ও পার্থক্য নাই—এমন কিছু বুঝায় না। কবি আমাদের চাহিতে বেশী দেখেন। কিন্তু বেশী দেখিলেও বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তিনি আপনার দ্রষ্টাস্বরূপ উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করেন, অবস্তুকে আশ্রয় করিয়া নহে। বাগানে ও জঙ্গলে ফুল, আকাশে নক্ষত্র, বায়ুমণ্ডলে পবন-বেগ, উষা ও অরুণের ঘনিষ্ঠতা, এ সকল তো সকলেই দেখিয়াছে, প্রতিদিন দেখিতেছে। কিন্তু এই সকল সামান্য নৈসর্গিক ঘটনা ও বিষয়ের ভিতরেও যে একটা সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন, বিশ্বব্যাপ্ত ও বিশ্বজনীন রস উথলিয়া উঠিতেছে, তুমি আমি তাহা দেখি ও দেখি না। কবি এটা দেখেন, আর এই দেখাতেই তাঁর কবিত্ব প্রমাণিত হয়।

ফুলে ফুলে করে কোলাকোলি,
গলাগলি অরুণ-উষায় ;
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে,
তারাটী তারার পানে ধায়।

এ রহস্য কবির দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। কিন্তু এই কবিকল্পনা প্রত্যক্ষ ফুল, অরুণ, উষা, মেঘ, নক্ষত্র ও তাহাদের প্রত্যক্ষ পরস্পরের সান্নিধ্যে অবস্থানাদির উপরে প্রতিষ্ঠিত। অতএব এ কল্পনা বস্তুতন্ত্র ও সত্য। কিন্তু কোনো কবি যদি গাইতেন :—

শারদ-পূর্ণিমার শুভ্র যোছনা,
কালবৈশাখীর ঘোরা অমানিশা,
দোঁহে দোঁহে গায়ে পড়িছে ঢলিয়া,
প্রেমেতে গলিয়া গিয়াছে মিশি।—

তাঁর কল্পনার অলৌকিক শক্তির যতই প্রশংসা করা যাউক না কেন, সে কল্পনা যে অলীক, অবস্তু, মিথ্যা, উদ্ভট, ইহা কিছুতে অস্বীকার করা যাইত কি? এই কবিতায় প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তা যে পরিমাণে প্রকাশিত হইত, রবীন্দ্রনাথের ফুলে ফুলে সহজ কোলাকোলি, ও অরুণ-উষার গলাগলিতে তেমনটা ফুটিয়া উঠে নাই, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। তথাপি রবীন্দ্রনাথের এই—"ফুলে-ফুলে করে কোলাকোলি"র ভিতরে যে রস ফুটিয়াছে, পৌর্ণমাসি ও অমাবস্যার কল্পিত মিলনে তাহা ফোটে নাই, ফোটা সম্ভবও নহে।

কল্পনা—সত্য ও অলীক

আসল কথাটা এই যে কল্পনা বস্তুকে সচরাচর যতটা অবাস্তব বলিয়া লোকে কল্পনা করে, বাস্তবিক তাহা ততটা অবাস্তব নহে। এক জাতীয় কল্পনা আছে, যাহা নিতান্তই কল্পনা—বস্তুর সঙ্গে ও সত্যের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আর এক জাতীয় কল্পনা আছে, যাহা

কল্পনা হইলেও সর্ব্বদা বস্তুতন্ত্র এবং সত্য। ইংরেজি ভাষায় এই জাতীয় কল্পনার দুইটা স্বতন্ত্র প্রতিশব্দ আছে। একটাকে ইংরেজিতে fancy বলে ; অপরটীকে imagination বলে। জড়বিজ্ঞান বা গণিত যে একান্ত বস্তুতন্ত্র ইহা সকলেই জানেন ও মানেন। কিন্তু জড়ের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা জড়ের জ্ঞান আর জড়বিজ্ঞান এক বস্তু নহে। জড়জ্ঞান সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু জড়বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিউটন্ আপেলের গাছ হইতে বৃন্তচ্যুত আপেল মাটিতে পড়িয়া গেল, ইহা চক্ষে দেখিলেন। কিন্তু এই দেখাতে বিজ্ঞান নাই। হাজার হাজার লোকে নিউটনের পূর্ব্বেও এরূপ হাজার হাজার ঘটনা বহুবার দেখিয়াছে। কিন্তু নিউটন্ কেবল বৃন্তচ্যুত আপেলের ভূপতনই দেখিলেন না, তার মধ্যে ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া মাধ্যাকর্ষিণী শক্তিকেও প্রত্যক্ষ করিলেন। এ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহে, মানস-প্রত্যক্ষ। এ সিদ্ধান্ত বা এ বিজ্ঞান নিউটনের দৃষ্টিকে ধরিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, তাঁর কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্ত্বমাত্রেই এরূপ কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই কল্পনা বস্তুতন্ত্র। ইংরেজিতে ইহাকে fancy বলে না, imagination বলে। জড়বিজ্ঞানের, জীববিজ্ঞানের, সমাজবিজ্ঞানের, ধর্ম্মের ও তত্ত্ববিদ্যার যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই imagination'এর উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে এই imaginationকে scientific, বা historic, বা religious, বা poetical বিশেষণাদির দ্বারা বিশিষ্ট করা হয়। কিন্তু এই imagination ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক কবি, নীতিজ্ঞ বা statesman, ধার্ম্মিক বা তত্ত্বজ্ঞানী, কিংবা চিত্রকর বা ভাস্কর, এ সকলের কিছুই হইতে পারেন না। এই জাতীয় কল্পনা সর্ব্বথাই বস্তুর রূপের সাক্ষাৎকারে জাগ্রত হইয়া, তাহার স্বরূপকে যাইয়া অধিকার করিতে আরম্ভ করে।

যাহা দেখা যায় তাহার প্রেরণায় সজাগ হইয়া এই কল্পনা যাহা দেখা যায় না তাহাকে প্রত্যক্ষ করে। এই কল্পনা বা imagination বস্তুতন্ত্র হইয়া বস্তুকে ছাড়াইয়া যায়। আর বস্তুতন্ত্র বলিয়া ইহা সত্য, স্বপ্ন নহে, imaguation, fancy নয়। বস্তুতন্ত্রতার দ্বারাই বস্তুত কোন্ কল্পনা fancy, আর কোন্ কল্পনা imigination, ইহা প্রমাণিত হইয়া থাকে।

কাব্যসৃষ্টিতে imagination এবং fancy, দু'এরই খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। আর কোনো কবিতা imaginationএর উপরে না গড়িয়া, শুদ্ধ fancyর উপরে যদি গড়িয়া উঠে, তাহা যে সর্ব্বদা কবিতা হিসাবে একান্ত হেয় হইবে, এমনও বলা যায় না। কিন্তু imagination এর উপরে যে কাব্যসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা যেমন একই সঙ্গে সত্য ও সুন্দর হয়, কেবল fancy'র উপরে প্রতিষ্ঠিত কবিতা তেমন হয় না ও হইতে পারে না। fancy-র কবিতা আমরা কাণ দিয়া সম্ভোগ করিতে পারি, প্রাণ দিয়া ধরিতে পারি না। তার শক্তি ও সম্পদ শব্দের ঝঙ্কারের, ছন্দের ও যতির তানলয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়,—তত্ত্বের উপলব্ধি কিম্বা রসের প্রগাঢ়তার উপরে গড়িয়া উঠে না।

আমি যাহাকে বস্তুতন্ত্র কবিতা বলিয়াছি, ইংরেজিতে তাহাকে poems of imagination বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই জাতীয় কবিতার সংখ্যা যে কম, এমন বলা যায় না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কাব্যজগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যত পড়ি, ততই যেন তার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য, সত্য ও সৌন্দর্য্য চিত্তকে উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ঐ সকল poems of imagination, উহারা poems of fancy নহে। ঐ সকলের শক্তি ও সৌন্দর্য্য শব্দে নয়, অর্থে। ঐ সকলে কেবল কাণে মধু ঢালিয়া দেয় না, কিন্তু প্রাণের ভিতরে বিশ্ব সঙ্গীতের

সঙ্গত জাগাইয়া তুলে। ধর্ম্ম-কবিতা বা ধর্ম্ম-গীতের আলোচনাতেও বস্তুতন্ত্রতা তার বিচারের মাপকাঠি। মায়িক সৃষ্টির এ শক্তি ও অধিকার নাই।

বস্তুতন্ত্রতা—বাহিরে ও ভিতরে

কাব্যসৃষ্টির বস্তুতন্ত্রতা সর্ব্বদা কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে। ধর্ম্মের কবিতা কবির ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে কাব্যসৃষ্টি যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে, তাহা বাহিরের নয়, ভিতরের। এ বস্তু অন্তরের জ্ঞানের ও রসের আশ্রয়ীভূত হয়। এ বস্তু আপনি সেই জ্ঞান ও সেই রস। বস্তুতন্ত্রতা বলিতে যে সকল ক্ষেত্রে বাহিরের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অধীনতা বুঝাইবে, এমন কোনো কথা নাই। বাহিরের নৈসর্গিক বস্তু যেমন বস্তু, অন্তরের জ্ঞান এবং রসাদিও সেইরূপ বস্তুপদবাচ্য হয়। অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও বস্তু। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, অনুভূতিগ্রাহ্য মাত্র। কিন্তু তাহাও "বস্তু"। প্রেমও সেইরূপ বস্তু, কিন্তু তার রূপও নাই, রসও নাই; শব্দও নাই, গন্ধও নাই। কোনো কিছুরই আদর্শ বা স্বরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; অথচ তাহাও বস্তু। এগুলির সত্য অনুভূতি বা উপলব্ধি হইতে যে কাব্য ফুটিয়া উঠে, তাহা এই জন্য বস্তুতন্ত্র হয়। আর যে কাব্যসৃষ্টি এ সকল অন্তরঙ্গ, অপরোক্ষ অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ না করিয়া তাহাদের কথা বলিতে যায়, তাহা সত্য অনুভূতির বা উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়া, বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া পড়ে।

অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য কি?

এখানে কেহ কেহ একটা প্রশ্ন তুলিতে পারেন। কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে যে কাব্যসৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই যদি বস্তুতন্ত্র হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মাদি অন্তরঙ্গ বিষয়ের কবিতা তো কবির অন্তরঙ্গ

অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠালাভ করে। আর তাহা হইলে, সে কবিতার সত্যাসত্যের প্রমাণ কবি নিজে; অপর কেহ হইতে পারেন না। বহির্বিষয়ের অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য বাহিরের কথা, অন্তরঙ্গ বিষয়ের প্রামাণ্য সেরূপ বাহিরের কথা নয়।

কিন্তু কথাটা সত্য নহে। বহির্বিষয়ের প্রামাণ্য, এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে। আমার চক্ষেই আমি আকাশের নীলিমা বা দুর্ব্বাদলের শ্যামলতা প্রত্যক্ষ করি। আকাশ যে নীল, দুর্ব্বাদল যে শ্যাম,—ইহার প্রামাণ্য আমার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষেরও সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের একটা বাহিরের মাপকাঠি আছে। আমার মতন আর দশজনের অভিজ্ঞতা সেই মাপকাঠি। জড়বস্তু বিশেষের বিবিধ গুণাগুণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে জগতের জনগণের সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা জড়বিজ্ঞানের প্রামাণ্য, শুদ্ধ ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা তার সত্যাসত্য সপ্রমাণ হয় না। অন্তরঙ্গ রাজ্যেও ঐ এক কথা। জগতের তত্ত্বজ্ঞানী এবং ভক্তসমাজের সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা সেইরূপ ধর্ম্মাদি অন্তরঙ্গ-বিষয়ের প্রামাণ্য। কোন্ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা সত্য, আর কোন্‌টা অসত্য বা কল্পিত এই কষ্টিপাথরে তাহা কষিয়া দেখিতে হয়। এই সকল জ্ঞানী ও ভক্ত মহাজনেরা নানা ভাষায়, নানাবিধ উপমা অলঙ্কার রূপকাদির সাহায্যে আপন আপন অন্তরের গভীরতম অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিলে, ইঁহাদের উপদেশ ও সাক্ষ্যের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা দেখা গিয়া থাকে। এ সকলকে পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাদের ভিতরকার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বা তত্ত্বগুলি বাহির করিতে হয়। আর তখন সেই তত্ত্বের দ্বারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। এই সকল অন্তরঙ্গ ব্যাপারের কোন্‌টা সত্য আর কোনটা কল্পিত, কোনটা অসত্য আর

কোন্‌টাতে সত্যাভাস মাত্র আছে ;—ইহা সহজে ধরা পড়িয়া যায়। এই কষ্টিপাথরে ধর্ম্মবিষয়ক কবিতার বা সংগীতের বস্তুতন্ত্রতাদির পরীক্ষা করিতে পারা যায়। যে কবিতা বা সংগীত বস্তুতন্ত্র ও সত্য, ধর্ম্মজগতের সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ সঙ্গতি লক্ষ্য করিতে পরো যায়। যাহাতে বস্তুতন্ত্রতার, অর্থাৎ সত্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব থাকে, তাহাও এই প্রমাণ প্রয়োগে ধরা পড়িয়া যায়।

রাখি-বন্ধন

এবারেও একরূপ করিয়া রাখি উৎসব হইয়াছে। কিন্তু সাত বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবটী দেশময় জাগিয়া উঠিয়াছিল, তার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। মৌলবী লিয়াকৎ হুসেন না থাকিলে, এবারে কলিকাতার রাখি-উৎসব আদৌ হইত কি না সন্দেহ। অথচ মৌলবী সাহেব হিন্দু নহেন; কিন্তু প্রথমাবধি এই রাখি-উৎসবটী একান্ত হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

এবারে যে ভাল করিয়া এ উৎসবটী হয় নাই, তার প্রধান কারণ বাংলার নেতৃবর্গের ঔদাসীন্য। এ ঔদাসীন্য তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক না হইলেও, দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিক দিয়া বিচার করিলে, কিছুতে মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে করা যায় না। এই কয় বৎসরের স্বদেশী আন্দোলন ইঁহাদের পক্ষে কেবল একটা সুচতুর পলিটিক্যাল্ চাল মাত্র ছিল: ইঁহারা ইংরেজকে ভয় দেখাইবার জন্য এ গোলটা বাধাইয়া তুলেন। বঙ্গভঙ্গ রহিত করাই ইঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যেরূপ প্রকারে হউক, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং এ সকল গোলমালের ব্যাপারকে আর জাগাইয়া রাখার কোনো প্রয়োজন নাই।

কিন্তু দেশে অনেক লোকে এই সকলকে এভাবে দেখে নাই॥ তারা আমাদের অজীর্ণ পলিটিক্স্ বুঝে না। আমাদের ধার করা পলিটিক্যাল ভাবের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে তারা পারে না। আমাদের বিজাতীয় বুলি ও বিদেশীয় চাল, এসকলের কোনো ধার তারা ধারে না। তারা বুঝে দুনিয়ায় এক বস্তু—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ভাবিয়াই তারা ৩০শে

আশ্বিনে এমন করিয়া আবালবৃদ্ধবণিতা মিলিয়া গঙ্গাস্নান করিয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞানেতেই তারা এদিন আপন আপন ঘরের রন্ধনশালায় আগুন জ্বালে নাই। ধর্ম্মভাবেই তারা এতদিন স্বদেশের সেবাতে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে। এগুলি কেবল একটা পলিটিক্যাল চাল মনে করিলে, তারা কখন এমন করিয়া মাতিয়া উঠিত না।

ফলতঃ স্বদেশীর সকল ব্যাপার রাষ্ট্রীয় নেতারা একভাবে দেখিয়াছেন, আর দেশের লোকে অন্যভাবে করিয়াছে। ইঁহারাও যে রাখিবন্ধনের ধর্ম্মের দিকটা দেখেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু নিজেরা কখনও ইহাকে ধর্ম্মকর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; ধর্মের প্রেরণা জাগাইয়া দেশের লোককে কেবল মাতাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। এইজন্য অনেকে গঙ্গাস্নানকে পৌত্তলিকতা সংশ্লিষ্ট অধর্ম ও কুসংস্কার ভাবিয়াও, দেশের লোককে গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিয়া, স্বদেশী সংকল্প গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কালী দুর্গা প্রভৃতি পূজাকে আযৌবন "ভূতপরস্তি" জ্ঞানে পাপ বলিয়া পরিহার করিয়াও, কালী-বাড়ীর বা দুর্গাবাড়ীর প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া প্রতিমা সাক্ষী করিয়া, দেশের লোককে বয়কট মন্ত্র পড়াইয়াছেন। ইংরেজের কেতাবে পড়িয়াছিলাম যে য়ুরোপের কোনো কোনো অতিযুক্তবাদী পণ্ডিত রাজা ও পুরোহিত মিলিয়া আপন আপন স্বার্থের সন্ধানে যাইয়া, ধর্মকর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। এই ভাবে আমাদের অনেক "স্বদেশী" নেতাও বোধ হয় রাখি প্রভৃতি স্বদেশী অনুষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁদের কাজ যখন হাঁসিল হইয়া গিয়াছে, তখন এসকল স্বাদেশিক অনুষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখার কোনো প্রয়োজন বোধ যে আর তাহাদের থাকিবে না, ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীতিজ্ঞ হইলে ইঁহারা এমন আত্মঘাতী পন্থা অবলম্বন করিতেন না। তাঁরা এগুলিকে পলিটিক্যাল চাল বলিয়া মনে

করিতে পারেন, এর উপরে যাইবার অধিকার তাঁদের এখনও জন্মায় নাই। কিন্তু দেশের লোকে যে এগুলিকে সরলভাবে ধর্মকর্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, এ জ্ঞানও কি তাঁদের হয় নাই? অন্ততঃ সে জন্যও তো এই অনুষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পূর্ব্বের মতন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ছিল। দেশের লোকে যে এখন ইহা বুঝিল যে এঁরা ধর্ম লইয়া পলিটিক্যাল্ খেলা খেলেন, ইহাতে তাঁহাদের নেতৃত্ব-মর্য্যাদা আর থাকিবে কি? আবার কখনো যদি এঁরা কোনো আপদে বিপদে পড়িয়া দেশের লোককে এরূপভাবে মাতাইতে যান, তারা আর কি তেমন করিয়া তাঁদের কথা শুনিবে? আজ রাখি, কাল ফাঁকি; এক বৎসর ৩০শে আশ্বিন, অরন্ধন; আর পর বৎসর সেই দিনেই আবার ভুরি ভোজন; এমন ছেলেখেলাকে দেশের লোকে আর কি ধর্ম্ম ভাবিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে যাইবে? রাখি ও অরন্ধন হিন্দুর পঞ্জিকায় উঠিয়াছে এই জন্য যে বাংলার হিন্দুসমাজ এগুলিকে একটা পূজাপার্ব্বনের সামিল করিয়া লইয়াছে। আর তাঁদের এই নূতন প্রতিষ্ঠানটা পঞ্জিকায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের নেতৃবর্গ কত না আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছিলেন! কিন্তু এবারে তাঁরা যেভাবে এই উৎসবটিকে "বয়কট" করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাতে এই প্রতিষ্ঠা আর থাকিবে কি? মোটা কথা এই, পলিটিক্যাল্ এজিটেষন্ আর স্বদেশী বা স্বাদেশিকতা এক বস্তু নহে। আর আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনটিকে একান্তভাবে পলিটিকস্-ভারাক্রান্ত করিয়া যে তাহাকে অনেকটা নষ্ট করা হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিতে পারি না।

* * *

ইহার উৎপত্তি পলিটিক্যাল্ সত্য। কিন্তু এ জগতে অনেক মহৎ বস্তুই অতি নীচ স্থানে জন্মিয়া থাকে। পাঁকে পদ্মের জন্ম হয়, কিন্তু তাই বলিয়া পঙ্কজ পঙ্কিল হইয়া থাকে না। অতি সামান্য

ঘটনা হইতে জগতের ইতিহাসে কত বড় বড় অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। আমাদের স্বদেশীও ঠিক সেইরূপ। ইহার-উৎপত্তি একটা আকস্মিক পলিটিক্যাল্ বিরোধে, সত্য। কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠা আমাদের চিরন্তন আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ও চরম আত্ম-চরিতার্থতা লাভে। বঙ্গ-ভঙ্গের অপমানের তাড়নাতে আমরা জাগিয়া উঠিয়াছি বটে, কিন্তু সেই অপমানের প্রতিকার বা প্রতিশোধ আমাদের জাগ্রত জীবনের এক মাত্র বা শ্রেষ্ঠ বা নিত্য কর্ম্ম নহে। সে প্রতিকার লাভের পূর্ব্বেও আমরা বঙ্গভঙ্গ রদ করা অপেক্ষা একটা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছিলাম। আর বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়াছে বলিয়া সে লক্ষ্যলাভ হইয়াছে, এমন মনে করি না। সুতরাং সত্য স্বাদেশিক চেষ্টার বিরাম কিছুতে শুভ হইতে পারে না।

"স্বদেশী"

কিন্তু এ চেষ্টার বিরাম না হইলেও, প্রথমে স্বদেশী ভাবের যে উচ্ছ্বাস ছিল, তাহা যে এখনও থাকিবে, এমন আশা করা অসঙ্গত। সুতরাং এবারে তেমন সুরগোল করিয়া রাখি-উৎসব হয় নাই বলিয়া আমার কোন দুঃখ বা নিরাশা হয় নাই। প্রতিদিন নদীতে আর বান ডাকে না। সাগর-বক্ষেও অষ্টপ্রহর একটানা কেবল জোয়ারের প্রকোপ প্রকাশিত হয় না। হয় না বলিয়াই জগতের মঙ্গল। জোয়ারের পর ভাটা আসে বলিয়া, বসুন্ধরা দিনে দিনে নূতন পলির প্রলেপ ধারণ করিয়া উর্ব্বরা হইয়া উঠেন। মানবের জীবনেও এইরূপ ভাবের জোয়ার ভাটা খেলে। কেবল একটানা প্রবল ভাবের বন্যাতে যদি আমরা ভাসিয়া চলিতাম, তবে সে টানের মান থাকিত না, আর আমাদের প্রাণ বাঁচান মুস্কিল হইয়া পড়িত। আমাদের জাতীয় জীবনের মরা গাঙ্গে যে একবার বান ডাকিয়াছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। আর সেই তরঙ্গভঙ্গ কমিয়া গিয়া, এখন যে সে ভাবের ও ভক্তির স্রোত

মন্দগতিতে নিঃশব্দে চলিতেছে, ইহা স্বভাবের নিয়ম। বান ডাকিয়াছিল। সে বানের জলে কত ব্রহ্মডাঙ্গা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, আবার ভাটা পড়িল, জল নামিয়া গেল; ইহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু কতটা পরিমাণ পলি এ বানের জলে দেশের প্রাণের উপর আনিয়া ফেলিয়া গিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। তারই দ্বারা এই জোয়ারের সফলতার বা নিষ্ফলতার পরিমাপ করিতে হইবে।

আর এইভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, স্বদেশী যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিছুতে তো এমনটা মনে হয় না। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা স্বদেশকে যে চক্ষে দেখিতাম আজ যে সে চক্ষে আর দেখি না, এ বিষয়ে তো আর বিন্দুমাত্র ভুল নাই। এই কয় বৎসরের ঝড় বাতাসে আমাদের স্বদেশাভিমানকে যে বিশুদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছে ইহা কি অস্বীকার করা যায়? বিদেশের সভ্যতা ও সাধনা আমাদিগকে কিছুকাল পূর্ব্বে যেভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, আজ যে আর সেভাবে আঁকড়াইয়া রাখে নাই, ইহা তো সত্য কথা। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা পরের চক্ষে নিজেকে দেখিতাম; আজ যে আর তাহা করি না, চারিদিকে তো তার প্রমাণ পরিচয় পাইতেছি। স্বদেশ আর আমাদের নিকট একটা সুখকর কল্পনা নহে, কিন্তু সত্য বস্তু। এই কয় বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে যে আমাদিগের স্বাদেশিকতাকে এইরূপ বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে, ইহা বা অস্বীকার করিতে পারি কি? আর এই সকলের দ্বারা স্বদেশীর সফলতার বা নিষ্ফলতার পরীক্ষা করিতে হয়,—বাহিরের সুরগোলের বা আন্দোলন আস্ফালনের দ্বারা এ বিচার হয় না।

এ জগতে সকল ব্যাপারেই কিছুটা অপব্যয় ও অপচয় হইয়া থাকে। চেষ্টামাত্রেই স্বল্প চিন্তাশক্তি ক্ষয় করে। সুতরাং আমাদের এই কয় বৎসরের স্বাদেশিক চেষ্টাতে যে একবারে কোনো অপচয় বা

শক্তিক্ষয় হয় নাই, এমন বলিতে পারি না। আমরা যা করিতে গিয়াছিলাম, সকল দিক দিয়া তাহা সফল হয় নাই। কোনো কোনো দিকে হয়ত এক করিতে যাইয়া, অজ্ঞতা বা অসমর্থতা নিবন্ধন আর এক করিয়া বসিয়াছি। কিন্তু এরূপ অপচয় ও অসমর্থতা মানুষী চেষ্টামাত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই অপচয় বা নিষ্ফলতা দেখিয়া নিরাশ হইলে চলিবে কেন?

সাধন-পথে প্রবেশ করিবার সময়, গুরুশক্তি-সঞ্চারে সাধক প্রথমে এক অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ করেন। তপজপ, ঋদ্ধিসিদ্ধি, সকলই তখন করতলন্যস্ত আমলকীবৎ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হয় না। সে আনন্দের উদ্দেশ্য লোভকে জাগান, সাধনের প্রবৃত্তিকে বলবতী করা, বিনা সাধনে সস্তায় সিদ্ধি দান করা নহে। এই জন্য ক্রমে প্রথমকার এই আনন্দ ও এই উচ্ছ্বাস, এ রস ও এ আবেশ সকলই শুকাইয়া যায়। তখন সাধক প্রকৃতপক্ষে সাধনাতে প্রবৃত্ত হন। তখন হইতে তিলে তিলে অশেষ প্রকারের সংযম শাসন, ব্রত নিয়মাদির দ্বারা আপনাকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া, দুর্বৃত্ত প্রবৃত্তি কুলকে সংযত করিয়া, সাধনের বৈরী যে ভাব ও অবস্থা সে সমুদায়কে নষ্ট বা জয় করিয়া, পরে বহু ক্লেশে ও বহুযত্নে সেই প্রথমকার অস্থায়ী অবস্থাতে আপনাকে পুনরায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে সিদ্ধির পথে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। জাতীয় জীবনেও জাতির কর্ম্মক্ষয় হইতে আরম্ভ করিলে ভগবৎ-শক্তিসঞ্চারে এইরূপ নব-ভাবের ও নব-শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। জনমণ্ডলীর প্রাণে মুক্তিবাসনা জাগাইয়া দেওয়াই এ সঞ্চারের লক্ষ্য। নূতন বর্ষার জলে যেমন শুষ্ক খালবিলের মাছগুলি উদ্দাম লাফালাফি আরম্ভ করে, অচেতন জনমণ্ডলীও এই নব চেতনাসঞ্চারে সেইরূপ উদ্দাম হইয়া উঠে। কিন্তু এভাব চিরদিন থাকে না। থাকে না বলিয়া দুঃখ করিবার বা নিরাশ হইবার কোনো কারণ নাই।

সাত বৎসর আগে আমরা একটা প্রবল ও অস্বাভাবিক ভাবাবেগে অতি-চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম। মানুষ এরূপ ভাবের আবেগে যা' কিছু বলে তার সত্য ও যা' কিছু করে তার স্থায়িত্ব কোথাও থাকে না। রাগের মাথায় আমরা যে সংকল্প করি, সে সংকল্প কখনও ঠিক সাধু সংকল্প হয় না। আর রাগের মাথায় মানুষ ভগবানকে ডাকিলেও সে ডাক যে তিনি শোনেন না, ইহাও কিছু বিচিত্র নহে। "বাঙ্গালীর পণ" তখন ছিল বিলাতী বর্জ্জন; "বাঙ্গালীর আশা" তখন ছিল স্বারাজ্য প্রাপ্তি। বাস্তবিক যে বাঙ্গালী তখন একেবারে বিলাতী বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল, তাহা নয়। আর বাঙ্গালী যে সত্য সত্য স্বারাজ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও নয়। এ দুটাই একটা আকস্মিক কারণে, একটা আকস্মিক ভাবের প্রেরণায় আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল মাত্র। আর এই উভয় সংকল্পের অন্তরালে একটা অসংযত ও অসঙ্গত পরজাতি বিদ্বেষও যে জাগিয়া ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আর বিদ্বেষ হইতে যে সংকল্প জন্মে ভগবানের রাজ্যে তাহা কখনো সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের এই পণ ও এই আশা, এই কাজ ও এই ভাষা যে সম্পূর্ণ রূপে সত্য হয় নাই, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু এ নিষ্ফলতা সত্ত্বেও এই কয় বৎসরের স্বদেশী চেষ্টাতে যে কেবলমাত্র অযথা শক্তিক্ষয় হইয়াছে, এমনও মনে করি না। আসল কথাটা এই যে প্রথম রাখিবন্ধনের সময় ও তার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্যে ছিল কেবল আমাদিগকে সচেতন করা, একেবারে স্বপ্রতিষ্ঠ করা নয়। বহুদিন আমরা ঘুমাইয়া ছিলাম। আমাদের ভাব ও চিন্তা, আশা ও আদর্শ সকলই বিদেশীয় সাধনা ও শিক্ষার প্রভাবে একটা অস্বভাবিক বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছিল। এই গভীর আত্মবিস্মৃতির সময়, আমাদিগকে এমন

করিয়া নাড়াচাড়া না দিলে, আত্মচৈতন্যের উদয় হইত না। এই জাতীয় আত্মচৈতন্যকে জাগ্রত করাই এই স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যের দ্বারাই ইহার সফলতা-নিষ্ফলতার বিচার করিতে হইবে। আর এইরূপ বিচার করিলে, এই কয় বৎসরের এই আন্দোলন যে এতটুকুও বিফলে গিয়াছে, এমন মনে করিতে পারি না।

(রচনার কাল—কার্তিক, ১৩১৯ সাল।)

স্বদেশী ও বয়কট

যাঁরা বয়কট বা বিলাতী বর্জ্জনকে "স্বদেশীর" মুখ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করেন, তাঁরা স্বদেশী বস্তুটি যে কি, ইহা ধরিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কারণ প্রকৃত স্বদেশী কেবল নুন চিনির ব্যাপার নয়। ভারতের যে নিজস্ব একটা সনাতন সাধনা ও সমাজ-প্রকৃতি আছে, তারই উপর সত্যকার স্বদেশী প্রতিষ্ঠিত। আর এই সত্য স্বদেশী বস্তুকে যে "বয়কট" ছাড়িয়াও রাখা যায়, আর "বয়কট" রাখিয়াও নষ্ট করিতে পারা যায়, আমরা অনেকে এ পর্য্যন্ত এই কথাটা ভাল করিয়া ধরিয়াছি কিনা সন্দেহ।

বিলাতী বর্জ্জনের পণ চিরকাল আমরা রক্ষা করিতে পারিব না, পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। যাঁরা এই 'বয়কট' জারী করেন, তাঁরা নিজেরা যে এ বিষয়ে খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন, এমনও নয়। এটা কেবলমাত্র একটা পলিটিক্যাল্ চাল ছিল। ইংরেজকে ভাতে মারিবার চেষ্টা করিয়া বঙ্গভঙ্গের শোধ তুলিবার ইচ্ছা হইতে এই বয়কটের প্রতিষ্ঠা হয়। অনেকে এতটাও করিতে চান নাই। তাঁরা ইংরাজের বাণিজ্য নষ্ট করিবার ভয় দেখাইয়াই আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন। আর ইহাই যখন বয়কটের মূল বা জন্ম কথা, তখন এই বয়কট যে চিরকাল থাকিবে না, ইহা পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। এইজন্য ন্যাশন্যালিষ্ট্ দলের কেহ বোধ হয় কখনো পুরোহিত সাজিয়া দেশের লোককে বয়কটের মন্ত্রপাঠ করান নাই।

বয়কট বা বিদেশী বর্জন পণ কখনো চিরদিন থাকিবে না, থাকিতে পারে না। চিরদিনের জন্য এরূপ সংকল্প কোনো জাতি কখনো করে

নাই ও করে না। ভারতের বাহিরে আর কোনো জাতির সঙ্গে আমাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা অসম্ভব কথা। আর অপরের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্বন্ধ থাকিলে আমাদিগকে তাদের পণ্য লইতে হইবে, আর তাহাদিগকে আমাদের পণ্য পাঠাইতে হইবে। এরূপ পণ্যবিনিময় ব্যতীত বাণিজ্য চলে না। বাণিজ্য ব্যতীত কোনো জাতির অর্থশক্তি কখনো বাড়িয়া উঠে না। সুতরাং এই বহির্বাণিজ্যের খাতিরে আমদানি ও রপ্তানি দু'ই যখন সমভাবে রক্ষা করা আবশ্যক, তখন জাতীয় অর্থাগমের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া, বয়কট পণ রক্ষা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। সুতরাং যাবতীয় বিদেশীয় পণ্য পরিহার করা কখনই সম্ভব নয়। সেরূপ চেষ্টা করাও সঙ্গত নয়। অথচ আমরা স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম উচ্ছ্বাসে এই চেষ্টাই করিয়াছিলাম। তখন দেশে একটা নূতন শক্তি জাগান আবশ্যক ছিল বলিয়া, সে চেষ্টাও যে কোনোরূপে অসঙ্গত হইয়াছিল, এমনও বলা যায় না। ইহাকে এখন কোনো প্রকারের স্থায়িত্ব দিবার চেষ্টা করিলেই অন্যায় হইবে।

ফলতঃ এখন এমন একটা সময় আসিয়াছে যখন আমাদের বাণিজ্যগত স্বত্বস্বার্থ রক্ষার জন্য কোথায় কতটা পরিমাণে ও কি আকারে বিদেশীয় পণ্যকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া চলা আবশ্যক, আর কোথায় ইহা অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর, ইহা ধীরভাবে তলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। কতকগুলি বিদেশী পণ্য আসিয়া আমাদের নিজেদের কতকগুলি পণ্যের উচ্ছেদ সাধন যে করিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। দৃষ্টান্তস্থলে বিদেশীয় এনামেলের বাসনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব বিদেশীয় বস্তু কেবল যে আমাদের চিরাগত তামাকাঁসার বাসনগুলিকেই ক্রমে বাজার হইতে তাড়াইয়া দিতেছে তাহা নয়; তামাকাঁসার তৈজসপত্রে গরীব গৃহস্থের যে সঞ্চয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইত ও তাহার পরিবার পরিজনের ভবিষ্যতের সংস্থানের যে একটা ব্যবস্থা করিত, ও সবই এই বিদেশী

এনামেলের বাসনে একেবারে নষ্ট করিয়া দিতেছে। ইহাতে কেবল যে আমাদের আর্থিক অনিষ্টই হইতেছে, তাহা নয়। এই সকল পণ্য প্রচলিত হইয়া আমাদের প্রাচীন সমাজপ্রকৃতির মূলে পর্য্যন্ত আঘাত করিতেছে এবং দেশের দরিদ্র শ্রমজীবিদিগকে বিলাতী শ্রমজীবির ন্যায় "শোথের শেয়ালার মত" অসহায় করিয়া তুলিতেছে। এই জাতীয় বিদেশীয় পণ্যকে প্রাণপণে বর্জ্জন করা আবশ্যক। এরূপ আরো অনেক বিদেশীয় পণ্য আছে, যার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া আমাদের স্বদেশী পণ্য কিছুতে এখন আর আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; অথচ এ সকল পণ্য উৎপাদনের সরঞ্জাম ও শক্তি উভয়ই আমাদের দেশে ও সমাজে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এসকল বিদেশীয় পণ্য পরিহার করিতে না পারিলে আমাদের দারিদ্র্য দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু এরূপ পরিহারকে বহিষ্করণ বা বয়কট্ বলা কর্ত্তব্য নহে। ইহাকে বহিষ্করণ না বলিয়া আত্মরক্ষা বলাই সঙ্গত। ইংরেজীতে এরূপ বিদেশীয় পণ্যবর্জ্জনের চেষ্টাকে বয়কট বলে না, কিন্তু প্রোটেক্‌সন (Protection) বলা হয়। ইহার অন্তরালে পরপণ্য নষ্টের আকাঙ্ক্ষা নাই; কেবল আপনার পণ্যরক্ষা করিবার ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে. অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশেও ইংরেজের পণ্যের সঙ্গে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা হইতে নিজেদের পণ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ঐরূপ প্রোটেক্‌সনের (Protection) ব্যবস্থা আছে। এ সকল ইংরেজ উপনিবেশে ইংলণ্ডের পণ্য পর্য্যন্ত বিনা মাশুলে প্রবেশ করিতে পারে না। জার্ম্মাণী, ফরাসী, আমেরিকা প্রভৃতি আধুনিক জগতের প্রায় সকল দেশেই বিদেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে নিজেদের পণ্যকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ প্রোটেক্‌সনের ব্যবস্থা আছে। কেবল ইংলণ্ডেই এ ব্যবস্থা নাই। কিন্তু ইংলণ্ডেও কতদিন

যে এই তথাকথিত অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, বলা যায় না।

কিন্তু জার্ম্মাণী বা আমেরিকা, ফরাসী বা রুশিয়া, এমন কি ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশেও যে আত্ম-শাসনের শক্তি আছে, আমাদের সে শক্তি নাই। আমাদের রাষ্ট্রশক্তি দেশের লোকের করায়ত্ত নহে। ক্যানাডার বা অষ্ট্রেলিয়ার লোকে যেমন নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের রাজস্বের ব্যবস্থা করে, নিজেদের উপরে নিজেরা ট্যাক্স বসায়, আমরা সেরূপ পারি না। আমাদের এ অধিকার থাকিলে আর স্বদেশী সুতা ও কাপড়ের উপরে এখন যে মাশুল আছে, তাহা কখনো বসিত না। আর আমাদের এ অধিকার নাই বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশে স্বদেশীয় পণ্যের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে, সেরূপ ব্যবস্থা আমরা এখানে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি না। এখানে আমরা কেবল নিজেরা ধর্ম্মঘট করিয়া, আপনাদিগের স্বেচ্ছাকৃত স্বার্থত্যাগের শক্তির দ্বারা সস্তা বিদেশীয় পণ্যের সাংঘাতিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে নিজেদের পণ্যবিশেষকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারি। বিদেশী এনামেলের বাসনে আমাদের দেশের তামাকাঁসার পণ্যগুলির একান্ত উচ্ছেদ-সাধন করিতেছে বলিয়া আমরা নিজেরা সংকল্প করিয়া এগুলিকে বর্জ্জন করিতে পারি। বিলাতী কাপড়ে আমাদের তাঁত জোলাদিগের ব্যবসায়কে একেবারে উচ্ছেদ করিতেছে দেখিয়া, আমরা একটু বেশী দাম দিয়াও স্বদেশী তাঁতের কাপড় কিনিব, কিন্তু বিলাতের আমদানী মিলের কাপড় কিনিব না এই সংকল্প করিয়া, কিঞ্চিৎপরিমাণে আমাদের তাঁতগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি। ইহাতে কোনো অপরাধ বা অধর্ম্ম নাই। এইরূপ ভাবে, প্রয়োজনমত, নিজেদের পণ্যের খাতিরে, কোনো কোনো বিদেশী পণ্যকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবার সংকল্পকে বহিষ্করণ

বা বয়কট-পণ বলা যায় না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, স্বরাষ্ট্রের স্বত্বস্বার্থের সঙ্গে পররাষ্ট্রের স্বত্বস্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হইলে পররাষ্ট্রের অসংযত আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আস্ফালনকে সংযত করিবার ইচ্ছা হইতে বহিষ্করণ বা বয়কটের উৎপত্তি হয়। কিন্তু নিজেদের পণ্য রক্ষা করিবার জন্য, বিদেশীয় পণ্যের সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা সঙ্কোচ করিবার উদ্দেশে, যে বিদেশীয় পণ্য পরিহারের চেষ্টা করা হয়, তাহার অন্তরালে কোনো প্রকারের রাষ্ট্রীয় বাদপ্রতিবাদ বা রেষারেষি বিদ্যমান থাকে না। বয়কট ছাড়িয়াও আমরা, বিনা অপরাধে, এরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান শঙ্কটে স্বদেশের পণ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি। আর ইহা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই পরিহার নীতি সকল প্রকারের বিদেশীয় পণ্য সম্বন্ধে অবলম্বন করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তাহাতে স্বদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতি বই লাভ নাই। আর সেরূপ করিতে গেলে এই নীতি বিদ্বেষবিজড়িত বয়কটে পরিণত হইবে। আর সর্ব্ববিধ বিদেশীয় পণ্য সম্বন্ধে যদি পরিহার নীতি অবলম্বন করা অসম্ভব ও অসঙ্গত হয়, তবে কোন্ বিদেশীয় পণ্যকে আমরা একান্তভাবে পরিহার করিতে চেষ্টা করিব, ইহা স্থির করিবার জন্য স্বদেশের পণ্যজাতের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের উন্নতির আশা কি ও কতটা, এ সকল বিষয়ের তন্ন তন্ন বিচার ও অনুসন্ধান করিতে হইবে। কোন্ বিদেশীয় পণ্যের সঙ্গে আমাদের কোন্ স্বদেশী পণ্যের মারাত্মক প্রতিযোগিতা দাঁড়াইতেছে, সে স্বদেশী পণ্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কি ও কতটা এই পরিহারনীতি অবলম্বনে সে পণ্যকে আমরা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব কি না;—এই সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এরূপ আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া যে সকল বিদেশী পণ্য একান্তভাবে পরিহার করা সম্ভব ও সঙ্গত, ইহা ঠিক হইলে পরে, সে সম্বন্ধে লোকমত

সংগঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল তাহাতেও কুলাইবে না। যে সকল স্বদেশী পণ্যকে বাঁচাইবার জন্য এই পরিহারনীতি অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে, সেই সকল পণ্য যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও বাজারে তার অপর্য্যাপ্ত চালান যাইতে পারে, তারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য মূলধন সংগ্রহ করিয়া, এই পণ্য যাঁরা উৎপাদন করেন, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দাদন দিয়া এই পণ্য উৎপাদনে প্রোৎসাহিত করিতে হইবে। তার পর উৎপন্ন পণ্য উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া লইয়া, বাজারে বাজারে চালান দিতে হইবে। আর এ সকলে ধনীর মুনাফা ও মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের দালালী যত কম দিয়া পণ্যের মূল্য কমাইয়া রাখিতে পারা যায়, তারও চেষ্টা করিতে হইবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্য লইয়া লোভী ধনী ও ব্যবসায়ীগণ গরীব, সরল, স্বদেশপ্রেমিকদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ কিরূপ ভাবে শোষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বদেশী পণ্যের উদ্ধারকল্পে যদি এই ভাবে, কোনো কোনো বিদেশীয় পণ্যকে বর্জ্জন করিতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রকার অযথা ও অবৈধ মুনাফার পথ বন্ধ করা আবশ্যক। এইরূপে স্বদেশী পণ্য প্রচারের জন্য একটা নিঃস্বার্থ জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তবে এই বিদেশী পরিহার চেষ্টা নিঃস্বার্থ ও সার্থক হইবে। কেবল উৎসাহে এ কাজ হইবার নহে। কেবল বক্তৃতা করিয়া বা খবরের কাগজে লিখিয়া এ সকল চেষ্টা সফল হয় না। বক্তৃতাদির দ্বারা দেশের লোকের মনে একটা স্বার্থত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জাগাইলে, তাহার ফলে কেবল শকুনির দলই পরিপুষ্ট হয়, স্বাদেশিক চেষ্টা সফলতা বা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না, এই সাতবৎসরে আমরা ইহার বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছি।

(রচনাকাল—কার্তিক, ১৩১৯ সাল)

বৈষ্ণব কবিতার কথা

বৈষ্ণব কবিতার প্রধান গুণ ইহাদের মানুষী ভাব। সাধারণ লোকে, এমন কি বৈষ্ণব সাধকেরা পর্য্যন্ত এই সকল পদাবলীর মধ্যে দেবতার লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহা জানি। কিন্তু এই দেবতাও যে মানুষ, একথা পাঠকেরা বিস্মৃত হইলেও, শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণব কবিগণ কখনও ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অথবা যিনি যখন যেখানে এটি ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন সেইখানে তাঁহার কবিতায় গুরুতর রসভঙ্গ হইয়াছে।

এইজন্য মহাজন পদাবলী পড়িতে বসিয়া, সকলের আগে শ্রীকৃষ্ণ যে দেবতা, এই কথাটি ভুলিয়া যাইতে হইবে। বৃন্দাবনলীলা যে নরলীলা, বৃন্দাবনের সকলেই যে মানুষ—তোমার আমার মতন মানুষ, তোমার আমার মতন সুখদুঃখের অধীন, তোমার আমার মতন মায়ামমতায় আবদ্ধ—ইহা যারা বুঝে না বা বুঝিয়াও ভুলিয়া যায়, অথবা এই নরলীলাকে যারা একটা অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে, তাদের পক্ষে মহাজন-পদাবলীর নিগূঢ় রস সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করা আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব মহাজনেরা মাধুর্য্যের সাধক। আর বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বারম্বার বলিয়াছেন যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উন্মেষমাত্র মাধুর্য্য রস একেবারে উবিয়া যায়। ঈশ্বর-ভাবই ঐশ্বর্য্য। শ্রীকৃষ্ণকে যে ঈশ্বর মনে করিবে, সে কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য কদাপি আস্বাদন করিতে পারিবে না। সে একটা ব্রজ কল্পনা করিয়া লইবে। বন্ধ্যা যেমন পুত্রস্নেহ কল্পনা করে, সেইরূপ সে একটা নিতান্ত মনগড়া সম্বন্ধের আশ্রয়ে এই লীলারস আস্বাদন

করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ কল্পনাবলে তার পুলকাশ্রু প্রভৃতির সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিকার শারীরিক, সাত্ত্বিক নহে। খোলে চাঁটি পড়িলেই কাহারও কাহারও পা নাচিয়া উঠে, এ এক নাচা; আর অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাহাকে ছড়াইয়া দিয়া, তাহাদের চঞ্চল করিয়া নৃত্যশীল হওয়া অন্য কথা। একটা সাধারণ স্নায়বীয় উত্তেজনা মাত্র, আর একটা ভাবের তরঙ্গভঙ্গ। সেইরূপ কেবল কথায়, কেবল ছন্দে, কেবল ঝঙ্কারে, কেবল সুরে, অথবা কেবল একটা অলীক মানস-কল্পনাবলে পুলকাশ্রু প্রভৃতির উদ্রেক হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সত্য রসানুভূতির কোনও সম্বন্ধ নাই। সাধারণ লোকে, এমন কি অনেক গতানুগতিক তিলককণ্ঠিধারী বৈষ্ণব পর্য্যন্ত, এই ভাবেই মহাজন পদাবলীর রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর এই সকল অলীক ভাবপ্রবণ লোকের হাতে পড়িয়া মাঝখানে অমূল্য পদাবলী সকল আপনার যথার্থ প্রাপ্য মর্য্যাদা হারাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মানুষই হউন আর ঈশ্বরই হউন, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ ইহাদিগকে মানুষরূপেই আঁকিয়াছেন। আর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ইহাই আমাদের বাংলার বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব। অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণব-তত্ত্বের কথা বেশী কিছু জানি না; কিন্তু মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষরূপেই দেখিতে পাই। বাংলার বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিতেই যেন কুণ্ঠিত হয়, এমন মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, কিন্তু অবতারী। যিনি অবতার করান, তিনি অবতারী। সৃষ্টি ও স্রষ্টাতে যে পার্থক্য, অবতার ও অবতারীতে সেই পার্থক্য। আর অবতারী বলিয়া বাংলার বৈষ্ণবেরা বলেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" আর তাঁরা ইহাও বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের যে নররূপের বর্ণনা ভাগবতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মায়িক নয়,

আকস্মিকও নয়, কিন্তু তাঁর নিত্য-স্বরূপ। এই নিত্য-স্বরূপে ভগবান দ্বিভুজ, "ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ"। তাঁর চতুর্ভুজ ষড়ভুজাদি রূপই বস্তুতঃ মায়িক, ভক্তের তৃপ্তির জন্য তিনি এসকল অমানুষী ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করেন। দ্বিভুজ মুরলীধর রূপই তাঁর স্বরূপ। এই রূপই তাঁর নিত্যরূপ।

আর নররূপই যদি তাঁর নিত্যরূপ হয়, তবে মানব-ধর্ম্মও তাঁর নিত্যধর্ম্ম হইবেই হইবে। রূপে আর গুণে তাঁর মধ্যে ত কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না; তাহা হইলে তাঁর ভগবত্ত্ব ও পূর্ণত্ব নষ্ট হইয়া যায়। নররূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ রূপ, নরধর্ম্ম এবং মানবপ্রকৃতিও সেইরূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ। রূপে ও গুণে সকল দিক দিয়া তিনি মানুষ। তবে এই মানুষ অপূর্ণ, তিনি পূর্ণ; এই মানুষ-রূপ ও মানুষী প্রকৃতি বিকাশধারাতে তিলে তিলে ফুটিতেছে, তাঁর মধ্যে এ সকল নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া আছে। আমাদের নররূপ ও নরপ্রকৃতি পরিণামী; তাঁর নররূপ ও নরপ্রকৃতি নিত্যসিদ্ধ। আর আমাদের এই অপূর্ণতাই তাঁর ঐ পূর্ণতার প্রমাণ প্রদান করে। আমরা যে এখানে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিতেছি, তাহা হইতে কোথাও যে আমাদের এই মানবতা নিত্যকাল প্রস্ফুট হইয়া আছে, ইহা বুঝিতে পারি। আমাদের রূপ লালসা ঐ রূপকে নিয়ত খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের অন্তরে গুণের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাও ঐ অনন্ত গুণাধারকে অন্বেষণ করে। এই সকল ইন্দ্রিয়, এই মন, এই বুদ্ধি, এই আত্মা, এই সর্ব্বস্ব আমাদের সেই নরোত্তম ও পুরুষোত্তমের জন্য নিয়ত পিপাসিত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে। আর বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর সত্য রস আস্বাদন করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে এই নরোত্তম ও পুরুষোত্তম রূপেই দেখিতে হইবে।

নর আর নরোত্তম, পুরুষ আর পুরুষোত্তম সজাতীয়, সমানধর্ম্মী। এই নরের মধ্যেই ঐ নরোত্তম, এই পুরুষের ভিতরেই ঐ পুরুষোত্তম

রহিয়াছেন। আবার ঐ নরোত্তমের মধ্যেই এই নর, ঐ পুরুষোত্তমের ভিতরেই এই পুরুষ রহিয়াছে। এইজন্য নর নরোত্তমকে চেনে বুঝে, অত করিয়া ভালবাসে। যে যা নয়, সে তাহা জানে না, জানিতে পারে না; বুঝে না, বুঝিতে পারে না। আমরা মানুষ। যে ঈশ্বরে কোনো মানুষী ভাব ও মানুষী ধর্ম্ম নাই, আমরা তাঁকে কখনও জানিতে ও ভজনা করিতে পারি না। ভাবের ঐক্য ব্যতীত ভজনা হয় না। ঈশ্বরের ভজনা করিতে হইলে হয় ঈশ্বরকে মানুষ হইয়া নামিয়া আসিতে হয়, না হয় মানুষকে ঈশ্বর হইয়া উঠিয়া যাইতে হয়। খৃষ্টীয় সাধনা ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া তবে তাঁর ভজনা সম্ভব করিয়াছে। আমাদের দেশের বৈদান্তিক সাধনা অন্যদিকে মানুষকে ব্রহ্ম করিয়া উপরে তুলিয়া ব্রহ্মেতে যুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঈশ্বরকে নামাইয়া আনিয়া মানুষ করিলে তাঁর ঈশ্বরত্ব নষ্ট হয়, মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঈশ্বরের এই মানবত্ব সত্য না আরোপিত, এই প্রশ্ন উঠে। ঈশ্বর আর মানুষ যদি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী হন, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতে যাহা মানুষ নয়, আর মানুষ বলিতে যাহা ঈশ্বর নয়, যদি ইহা বুঝি, তাহা হইলে ঈশ্বর কখনও সত্যভাবে মানুষ হইতে পারেন না। আমাদের বৈদান্তিকেরা এইজন্য ঈশ্বরের মানবত্ব-স্বীকারকে মায়িক বলিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান ইতিহাসেও এরূপ মায়াবাদী সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। একদল প্রাচীন খৃষ্টীয়ান যিশুখৃষ্টের নরলীলাকে real নয়, apparent মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের বৈষ্ণব আচার্য্যগণ প্রচলিত অবতারবাদের এই স্ববিরোধিতা খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁরা বলেন—ঈশ্বরই মানুষ, নিত্যসিদ্ধ মানুষ,—গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং,—পরব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের (বা Ultimate Realityর) নিগূঢ় স্বরূপ মনুষ্যলিঙ্গ বা মনুষ্যাকৃতি বা নররূপ। এই নররূপ তাঁর নিত্যসিদ্ধ রূপ। এই জন্য তিনি নিজস্ব রূপে নরোত্তম বা পুরুষোত্তম।

কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে কেবল নরোত্তম বা পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি নরোত্তম বা পুরুষোত্তরূপে আবার নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি, যাবতীয় রসের ও সমুদয় অমৃতের মূর্ত্তি। রসবস্তু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নয়, আন্তরিক অনুভবের দ্বারা কেবল ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। ভালবাসা বস্তুকে কেউ কোনো দিন চক্ষু দিয়া দেখে নাই; কাণ দিয়া তার ধ্বনি বা শব্দ শোনে নাই; রসনার দ্বারা কেহ কখনো এই বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে নাই; নাসিকা দিয়া ইহার গন্ধও পায় নাই। এ বস্তু অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অগন্ধ, তথা অরস। অথচ রূপ রস শব্দ স্পর্শাদির সঙ্গে এই অতীন্দ্রিয় বস্তুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভালবাসার রূপ নাই, অথচ রূপের আশ্রয়ে, রূপের প্রেরণা ব্যতিরেকে এবস্তু জন্মে না বা জাগে না, আর জন্মিয়া বা জাগিয়া রূপকে আশ্রয় না করিয়া ইহা আপনাকে প্রকাশও করিতে পারে না। যে ভালবাসে তার মুখে, চক্ষে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমুদয় দেহের মধ্যে এই ভালবাসা আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। মাতালকে যেমন দেখিলে চেনা যায়, যে প্রেমমদে মাতোয়ারা তাহাকেও সেইরূপ দেখিলে চেনা যায়। প্রেমক্রোধাদি মনের ভাব হইলেও এসকল ভাব যখন মনে জাগে ও বাড়িয়া উঠে, তখন শরীরে পর্য্যন্ত একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকট হয়। এই রূপই এই সকল রসের মূর্ত্তি। এই সকল রসমূর্ত্তি একদিকে অন্তরের রসকে ঘন করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভোগের বিষয় করে; অন্যদিকে অন্তরের রসকে যখন এরূপভাবে বাহিরে ফুটাইয়া তুলে, তখন ইহাকে দেখিয়া আমাদের অন্তরের অচেতন রস সচেতন হয়, সুপ্ত ভাব জাগিয়া উঠে। হাস্যের মূর্ত্তিতে আমরা হাস্যরস আস্বাদন ও সম্ভোগ করি; আবার এই মূর্ত্তি দেখিলেও আমাদের হাসি পায়। প্রেমের মূর্ত্তিতেও এইরূপে প্রেম সম্ভোগ হয় ও প্রেমের উদ্দীপনা হয়। অন্তরের রস যতক্ষণ না এইরূপে আপনার নিজস্ব

মূর্ত্তির আশ্রয়ে ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণ তাহা আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভোগের বিষয় হয় না, আর আমাদের সুপ্ত রসকে জাগাইয়া তুলিতেও পারে না। যাঁহার মধ্যে সকল রস মূর্ত্তিমান হইয়া আছে, অর্থাৎ আমাদের অন্তরের যাবতীয় রস যাঁহাকে অন্বেষণ করে, যাঁহাকে দেখিয়া বা যাঁহার আভাস পাইয়া সমুদয় সুপ্ত রস জাগিয়া, নাচিয়া, উপচিয়া পড়ে,—তাঁহাকেই নিখিলরসমূর্ত্তি বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ নিখিরসামৃতমূর্ত্তি ; আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ইহাই বলে।

এই নিখিলরসামৃতমূর্ত্তির সঙ্গে একদিকে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও অপরদিকে আমাদের অতীন্দ্রিয়ানুভূতির অতি নিগূঢ়, অতি ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল ঐ মূর্ত্তির প্রত্যক্ষ লাভের জন্য নিত্য পিপাসিত। আবার নিতান্ত ইন্দ্রিয়রাজ্যে এ বস্তুর সন্ধান পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পাওয়া যায় না। এবস্তু যেন অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে, আত্মার অন্তরাকাশ হইতে বিদ্যুত-চমকের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের সমক্ষে চমকিয়া উঠে। চোখ এই বস্তুর লোভেই রূপে রূপে পিপাসু ভ্রমরের মতন চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। যার মুখখানি মিষ্টি লাগে, একবার দেখিলে আর বার দেখিতে ইচ্ছা হয়, চোখ ভাবে তারই মধ্যে বুঝি এই রূপ আছে। কিন্তু ইহার সাড়া পাইয়া হায়রাণ হয় মাত্র, ইহাকে ধরিতে পারে না। সকল ইন্দ্রিয়েরই এই দশা ও এই কথা। এরা সকলেই কি যেন চায় অথচ পায় না, কি যেন ধরে ধরে কিন্তু ধরিতে পারে না। এই পাগল-করা, এই মন-ভুলান, এই প্রাণ-মাতান বস্তুকেই মহাজনেরা শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভজনা করিয়াছেন। এইটি যে না জানে বা না বুঝে, এই কথাটি যে আপনার ভিতরকার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া ধরিতে না পারে, তার পক্ষে আমাদের বৈষ্ণব মহাজনদিগের পীযুষ-পদাবলী পড়া বা শোনা বিড়ম্বনা মাত্র।

যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলার কথা মহাজন-পদাবলীতে পড়িয়া

অমন আনন্দ পাই, সে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর না মানুষ, এ প্রশ্ন আমাকে করিও না। এসকল প্রশ্ন তুলিলে আমার প্রাণের সকল রস উবিয়া যায়, সকল আনন্দ নিভিয়া যায়। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতে আমার বুক শুকাইয়া যায়। তবে আমার প্রাণের, মর্ম্মের, আমার প্রকৃতির এ জ্বলন্ত পিপাসা মিটাইবে কে? আমি চাই রূপ,—ঈশ্বর অরূপ, আমি চাই রস, ঈশ্বর অরস, আমি চাই গন্ধ—ঈশ্বর অগন্ধ; আমি চাই আমার এই দুরন্ত ইন্দ্রিসকলকে শান্ত করিতে। এসকল আনন্দের দ্বারকে একেবারে বন্ধ করিতে চাই না, বন্ধ করিতে পারিও না; পারিলে আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। আর অশব্দ অরস অগন্ধ অস্পর্শ ঈশ্বরকে দিয়া আমার এই সকল শব্দস্পর্শরূপরসপিপাসু ইন্দ্রিয়কুল তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। অন্যদিকে কেবল মানুষকে দিয়াও আমার জীবন সার্থক হয় না। এই মানুষের মধ্যেই মানুষকে ছাড়াইয়া একটা কি যেন আছে, তারই টানে আমাকে অমন পাগল করিয়া তুলে। এই জন্য বাল্যে সখাকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণ জুড়াইত না, কে যেন আড়াল হইতে আমাদের দু'জনাকে আমাদের বাহিরে ও উপরে টানিয়া লইয়া যাইত। এইজন্যই ত যৌবনে সতীকে বুকে চাপিয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পিপাসাও বাড়িয়া যাইত, যত নিকটে পাইতাম ততই যেন আরও দূরে পড়িতাম, যত প্রাণ ভরিয়া উঠিত, ততই আরও ক্ষুধা বাড়িয়া যাইত, দেহ মন গলিয়া যতই পরস্পরের মধ্যে মিলিয়া যাইত, ততই আরও গলিবার আরও মিলিবার সাধ প্রবল হইয়া উঠিত। মানুষকে ছাড়িয়া আমাদের চলে না, মানুষকে লইয়াও চলে না। আমাদের প্রাণ চায় এমন কাহাকেও যাঁর মধ্যে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় মিশিয়া গিয়াছে, যাঁর মধ্যে বাস্তবই কল্পনা ও কল্পনাই বাস্তব হইয়াছে; যাঁকে দেখিয়া যাহা দেখা যায় না তার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি; যাঁকে ছুঁইয়া যাঁকে ছোঁয়া যায় না তাঁর অঙ্গসঙ্গ পাইতে পারি; যাঁর রসে

মাখামাখি হইয়া, কোনও রস যাঁহার রসকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁর অঙ্গে গলিয়া লাগিয়া থাকিতে পারি। আমার প্রাণ তোমার স্বর্গের ঈশ্বরকে চায় না। আমার প্রাণ তোমার মর্ত্তের উপচয়-অপচয়শীল, রোগশোকজরামৃত্যুর অধীন মানুষকে লইয়াও চিরদিন ঘর করিতে পারে না। আমার প্রাণ চায় তাহাকে যে মানুষ বটে, কিন্তু যার রোগ নাই, শোক মাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, যে নিত্য-সবল, নিত্য-সুস্থ, নিত্য-সুখী, নিত্য-রসময়, নিত্যানন্দময়, যে চিরকিশোর, চিরসুন্দর, যে আমার সকল আদর্শকে আয়ত্ত করিয়াছে, সকল চাওয়ার নিবৃত্তি করিতে পারে। মহাজন-পদকর্ত্তাগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে আঁকিয়াছেন, তিনি এই বস্তু। জগতের আর কোনো কবি-সমাজ, আর কোনো কাব্যে, কোনো সঙ্গীতে, কোনো চিত্রে বা কোনো ভাস্কর্য্যে অমন বস্তুটি আজ পর্য্যন্ত দিয়াছে বলিয়া জানি না। সকল দেশের সকল কবিই আংশিকভাবে এই চিরসুন্দরকে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সত্য। বৈষ্ণব মহাজনেরাও আংশিকভাবেই ইঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, মানি। এ বস্তুর নিঃশেষ অভিব্যক্তি সম্ভবে না। কিন্তু বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ এই অপূর্ণতার মধ্যে যতটা পরিমাণে এই পুরুষোত্তমের পরিপূর্ণ মূর্ত্তির আভাস দিতে পারিয়াছেন, আর কেহ তাহা পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। না পারারই কথা। কারণ আর কেউ ত এই জগতে, বিশ্বের চরম তত্ত্বকে অমন নিঃসঙ্কোচে আদর্শ মানবাকৃতি এবং পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ মানবপ্রকৃতি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহস পান নাই।

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই তিনটি রসকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় মহাজন-পদাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সখ্যাদি সম্বন্ধে আর সখ্যাদি রসে বিস্তর প্রভেদ আছে। সংসারে এ সকল সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই রস অতি দুর্ল্লভ বস্তু। রসবস্তুর দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে,—প্রথম এ বস্তু তরল, দ্বিতীয় এ বস্তু আনন্দময়। তরল

বলিয়া এ বস্তু সর্ব্বত্র সঞ্চার হইতে পারে, সকলকে আচ্ছন্ন, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। আর আনন্দময় বলিয়া এ বস্তু যাহাতেই সঞ্চারিত হয়, তাহাকে সুখময় ও উৎফুল্ল করিয়া তুলে। সর্ব্বসঞ্চারণশীলতা ও সর্ব্বানন্দদান রসের মুখ্য ধর্ম্ম। সখায় সখায় সম্বন্ধ সংসারে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সকল সখ্য সম্বন্ধেতে যে সখা-রস ফোটে, এমন বলিতে পারি না। এই সকল সম্বন্ধ সুখকর, ইহাও সত্য। কিন্তু এই সুখ সর্ব্বত্র সখাগণের দেহমনপ্রাণ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে না ও তাহাদিগকে ছাপাইয়া উঠে না। এই জন্য এ সকলকে সখ্য রস বলিতে পারি না। সখ্য-সম্বন্ধে যখন রস ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সখার জীবনটা সখাময় হইয়া যায়। সখার পঞ্চেন্দ্রিয় তখন সখাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সখার মন তখন অবিরাম সখারই ধ্যান করে। সখার সুখদুঃখ তখন সখাকে আসিয়া আচ্ছন্ন করে। তখন তাহাদের দুই দেহে একই প্রাণ যেন স্পন্দিত হয়। তখন জাগ্রত ও সুষুপ্ত উভয় অবস্থাতে, নিকটে ও দূরে সকল স্থানে, ইহারা একে অন্যের মধ্যে বাস করে। এই রস যখন প্রগাঢ় হইয়া ইহাদের দেহকে, ইন্দ্রিয়কে, স্নায়ু-মণ্ডলকে, মনকে, ভাবনাকে, এক কথায় ইহাদের পরস্পরের সমগ্রতাকে গ্রাস করিয়া বসে, তখন ইহারা চক্ষুসাক্ষাৎকার ব্যতীতও পরস্পরের রূপ দেখে, শ্রুতিসাক্ষাৎকার ছাড়াও পরস্পরের শব্দ শোনে, বহিরিন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে আপনাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা একে অন্যকে গ্রহণ করে ও একে অন্যের সঙ্গ লাভ করে। এই অবস্থা লাভ হইলে, সখ্যরস সখ্যরতিতে পরিণত হয়। ইহাই রসের চরম পরিণতি। আর এই পরিণত অবস্থা লাভ হইলেই সখ্য রসেতে, স্বেদকম্পপুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বিকার প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন দেহে এবং আত্মাতে, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ে, শরীর ও অশরীরীতে মেশামেশি ও মাখামাখি হইয়া যায়। আত্মা তখন দেহধর্ম্ম ও দেহ তখন আত্মার ধর্ম্ম লাভ করে।

আত্মা তখন দেহেতে নামিয়া, দেহেতে ছড়াইয়া পড়ে; আর দেহ তখন আত্মাতে উঠিয়া, আত্মাতে লুপ্ত হইয়া যায়। এ যে অপূর্ব্ব অবস্থা, বাক্যে ইহার বর্ণনা হয় না। যে ভাগ্যবলে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও এ অবস্থার আভাসের আস্বাদন পাইয়াছে, সে ঠারে-ঠোরে তাহা যে কি, ইহা একটু আধটু বুঝিতে পারে। অন্যের নিকটে ইহা হেঁয়ালি মাত্র।

শৈশব-যৌবনের প্রদোষালোকে দাঁড়াইয়া যে সখ্য আস্বাদন করিয়াছিলাম, তাহা ত কেবল একটা মানস বস্তু নয়। সখা ত কেবল আত্মা ছিলেন না। তাঁর শরীর ছিল, তাঁর রূপ ছিল। তাঁর শব্দ-স্পর্শরূপরসে আমাদিগকে আকুল করিয়াছিল। তারই জন্য ত, ঐ রসের লোভে

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

সে ত আমাদের কেউ ছিল না। সোদর ছিল না, অথচ প্রাণের দোসর হইয়াছিল। কুটুম্ব ছিল না, কিন্তু সকল কুটুম্ব অপেক্ষা বড় হইয়াছিল। তার মাকে মা ডাকিলে প্রাণ নাচিয়া উঠিত। তার বোনকে বোন বলিতে জীবন মধুময় হইত। কোনো সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই সকল সম্বন্ধে তাহাকে বাঁধিবার জন্য অস্থির হইতাম। সো নহে রমণ, হাম নহি রমণী—অথচ সকল ইন্দ্রিয় তাকে পাইবার জন্য আকুল ও পাইয়া বিভোর হইয়া থাকিত। জাগিয়া তারই কথা ভাবিতাম; ঘুমাইয়া তারই স্বপ্ন দেখিতাম। সে যে আমাদের কি ছিল, তাহা তখনও বুঝি নাই, এখনও বলিতে পারি না।

অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণং সৌখ্যৈ দুঃখ্যান্যোপহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥

—কোনো কিছু না করিয়াও কেবল কাছে থাকিয়াই সে যে আমাদের সকল দুঃখের উপশম করিত, সে যে আমাদের কি বস্তু ছিল, তাহা কেমন

করিয়া বলিব? যে এই অপূর্ব্ব বস্তুকে কেবল একটা নিরাকার অশরীরী আধ্যাত্মিক ভাব বলে, সে মিথ্যা কহে। যে ইহাকে কেবল একটা রক্তমাংসের স্নায়বীয় উত্তেজনা বলে, সে আরও বেশী মিথ্যা কহে। এই রসকে যে সকল প্রকারের শরীরধর্ম্মশূন্য ও ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত বলে, সে ইহা যে কি তাহা জানে না, তার ভাগ্যে এ বস্তুর আস্বাদন লাভ হয় নাই; অথবা জানিয়া শুনিয়া সত্যকথা ভাবিতে বা বলিতে তার সাহস হয় না। যে এই রসকে কেবল ইন্দ্রিয় বিকার বলিয়াই জানিয়াছে, সে'ও ইহার প্রকৃত আস্বাদন পায় নাই। অতীন্দ্রিয় হইয়াও এই রস ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ও আচ্ছন্ন করিয়াই আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে জন্মিয়াও ইহা নিয়তই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইয়া লীলা করে। একথা যে বুঝে, যে জানে, যে বলে, সে'ই এই রসবস্তু যে কি তার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে।

এই রস ইন্দ্রিয়-সহায়ে বস্তুর অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু রস আর অনুভব বা feeling বাস্তবিক এক বস্তু নহে। অনু অর্থ পশ্চাৎ এবং ভব অর্থ জন্ম—পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা জন্মে তাহাই অনুভব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুসাক্ষাৎকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহা জন্মে তাহাই অনুভব। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুসাক্ষাৎকারকে ইংরাজিতে perception কহে। এই perception-এর পশ্চাৎ পশ্চাৎ feeling-এর উৎপত্তি হয়। এই feeling বা অনুভব অতি মামুলী বস্তু। সকল মানুষেরই এই অনুভব হয়। পশুপক্ষীদেরও হয়। কীটপতঙ্গেরই যে হয় না, এমন কথা বলা যায় না। এ বস্তু রস নহে। তবে রসবস্তু অনুভব বা feeling হইতে ভিন্ন হইলেও এই অনুভবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, অন্য কোনও প্রকারে হয় না। রস মাত্রেই অনুভবের অধীন, অনুভব-তন্ত্র। আর অনুভব মাত্রেই বস্তু-সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়, বস্তুর অধীন, বস্তুতন্ত্র। এই জন্য রসমাত্রেই বস্তুতন্ত্র। বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত রস জন্মে না।

তবে অনুভবে আর রসে প্রভেদ এই যে, অনুভব আপনার বিশিষ্ট আশ্রয়টিকে ছাড়িয়া যায় না, ছাড়িয়া বাঁচে না; রস যে অনুভবের আশ্রয়ে জন্মে সর্ব্বদাই সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ছাড়াইয়া বর্ত্তমান ও অতীত আরও বহুবিধ অনুভবকে জাগাইয়া তুলে। চক্ষু রূপই কেবল দেখে, শব্দও শোনে না, স্পর্শও পায় না, গন্ধও গ্রহণ করে না, আস্বাদনও করে না। আর রূপ কেবল চক্ষুকেই জাগায়, শ্রুতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু চক্ষু রূপ দেখিবা মাত্র তাহার পশ্চাতে যে অনুভব জন্মে, তাহা যখনই রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপের সংস্পর্শে চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয় চঞ্চল ও পিপাসিত হইয়া উঠে। কেবল অনুভব রূপ মাত্র দেখে। তার বর্ণ ও গঠন কি ইহারই জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু এই অনুভব যখন রসে পরিণত হয়, তখন এই রূপই 'অপরূপ" হইয়া উঠে। তখন তাহা কেবল চক্ষুগ্রাহ্য রূপ থাকে না, মনোগ্রাহ্য, ধ্যানগ্রাহ্য, সমাধিগম্য "স্বপন স্বরূপ" হইয়া উঠে।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূরসঞে লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশন লাগি জনু অন্তর জীবন রহ কিযে যাব॥

রূপ ত সকলেই দেখে, রূপের অনুভব যার দুই চক্ষু আছে তারই ত হয়, কিন্তু রূপ দেখিয়া প্রমাদে পড়ে কে? যে পড়ে, বুঝিতে হইবে তার রস জাগিয়াছে।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তদবধি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কিছু বুঝই না পারি॥
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক্ ধক্ করয়ে পরাণ॥

কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥
না জানি কি করু মোহন চোর।
হেরইত প্রাণ হরি লই গেও মোর॥

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকাও শ্যাম দরশন পাইয়া কহিলেন :—

সই, কিবা সে শ্যামের রূপ
নয়ান জুড়ায় চেঞা।
হেন মনে লয়, যদি লোকভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা॥

সাক্ষাৎদর্শনে যেমন এক এক ইন্দ্রিয়স্পর্শে সর্ব্বেন্দ্রিয় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, নাম শুনিয়াও তাহাই হয়।

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়।

একে বলে রস। এযে কেবল অনুভব বা feeling নহে, ইহাও কি আবার বলিতে হয়, না বুঝাইতে হয়। তবে অনুভব বা feeling হইতে এই রসের বা romance এর জন্ম হয়, ইহাও অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অনুভব বীজ, রস এই বীজেরই গাছ। অনুভব বা feeling এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ নিত্য, অপরিহার্য্য। এই জন্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত কোনও সত্য রস জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে, অনুভবের অনুগমন করিয়া রসবস্তু জন্মে, ইহা যেমন সত্য, সেইরূপ এই রস জন্মিয়া কেবল নিজেই যে ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া যায় তাহা নহে, ইন্দ্রিয়গ্রামকেও আপনার সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে টানিয়া তুলিয়া লয়, ইহাও সেইরূপই সত্য। রসরাজ্যের একদিকে

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি. এবং অন্যদিকে আত্ম বস্তু ও অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার; আর রসবস্তু এই দুই রাজ্যের মধ্যে আনন্দের সেতু হইয়া আছে।

আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা এই সত্যটা দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পীযূষ পদাবলীতে প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে, শরীর ও অশরীরীতে, দেহে ও আত্মাতে অদ্ভুত মেশামেশি দেখিতে পাই! তারই জন্য এসকল অমৃত-পদাবলী পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সকলে মিলিয়া এক পরমানন্দের হাট খুলিয়া বসে।

"তদুচিত গৌরচন্দ্র"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে বাংলায় বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে এসকল পদাবলী গান করিতে হইলে, সকলের আগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ক দু'একটি পদ গাহিতে হয়। এই পদগুলিকে "তদুচিত গৌরচন্দ্র" কহে। তৎ—অর্থাৎ যে বিশেষ পালা গাহিতে হইবে তার, উচিত—অর্থাৎ উপযোগী, আর গৌরচন্দ্র—অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলা-বর্ণন,—ইহাই এই "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" সোজা অর্থ। কিন্তু ইহার মর্ম্ম কি ?

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তন এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। জয়দেব গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বকার লোক। তাঁর ললিত পদাবলী প্রথম হইতে গীত হইয়া আসিতেছিল। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসও মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী। মহাপ্রভু স্বয়ং ইঁহাদের পদাবলী-কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, এবং এসকল পদ অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলারস আস্বাদন করিতেন।

তবে মহাপ্রভু এসকল লীলাকীর্ত্তনের যে নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করেন, তাঁর পূর্ব্বে তাহা ততটা প্রকাশ পাইয়াছিল কি না, সন্দেহ। এসকল রসকীর্ত্তন রাগানুগা সাধনের সহায় ও অবলম্বন। আর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই রাগবর্ত্মের সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়। গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের মিলন হইলে যে নিগূঢ় কথোপকথন হয়, তাহা হইতেও এই সাধন অপ্রচলিত হইলেও যে একান্ত অর্ব্বাচীন নহে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এই রাগবর্ত্মটি তখন

পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ সাধকেরা নিগূঢ় ভাবে, নিজ নিজ অন্তরঙ্গ সাধনেই অবলম্বন করিতেন, লোক-সমাজে তাহা অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল। এই রাগবর্ত্ম টি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও বৈষ্ণব সাধনের esoteric বস্তু ছিল, লোকসমাজে প্রকাশ পায় নাই। মহাপ্রভু এই নিগূঢ় সাধনটিকে শুদ্ধা ভক্তির প্রকাশ্য রাজপথে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শুদ্ধা, রাগানুগা ভক্তিই তিনি "আপনি আচরিয়া" জগতকে দেখাইয়া ও শিখাইয়া গিয়াছেন। এইটিই মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ভক্তির বিশেষত্ব।

নাম-যজ্ঞ ও সংকীর্ত্তন

প্রাচীনকালে বহুবিধ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত। ক্রমে সে-সকল লোপ পাইয়া, নানাপ্রকারের ক্রিয়া-কলাপ ও প্রতীকোপাসনাদি প্রবর্ত্তিত হয়। মহাপ্রভু এসকলকে "বাহ্য" বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, নাম-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিলেন। "নামে রুচি, জীবে দয়া"—ইহাই তাঁর ধর্ম্মের বুনিয়াদ হইল।

হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।
হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম সার
কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর।

মহাপ্রভু ইহা প্রচার করিলেন। কলির একমাত্র যজ্ঞ এই নাম-যজ্ঞ। ভগবানের নামগান ও লীলাকীর্ত্তন উভয়ই এই নামযজ্ঞের অঙ্গ। ভক্ত বৈষ্ণবেরা নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তনও করেন। এই ভাবে দিনের পর দিন, ধারাবাহিক রূপে, রাধাকৃষ্ণের লীলা-গান হয়। এরূপ কীর্ত্তন-যজ্ঞের "অধিবাস" হইয়া থাকে। সংকীর্ত্তনে অধিবাসের একটি বিশেষ পালা আছে। এইটি মহাপ্রভুর লীলার অন্তর্গত। এই অধিবাসের পালার সব গানই মহাপ্রভু সম্বন্ধে, সুতরাং এই অধিবাসের পালাতে আর বিশেষ করিয়া "তদ্ভচিত

গৌরচন্দ্র'' গাহিতে হয় না। এটি নিজেই যে গৌরচন্দ্র। তবে কেবল সাধারণ মঙ্গলাচরণ স্বরূপ—"জয় রে! জয় রে! গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠাম" এই গানটি "অধিবাসের" পালার প্রথমে গীত হইয়া থাকে। কি করিয়া প্রথমে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনোৎসব প্রতিষ্ঠা করেন, এই "অধিবাসের" পালাতে তার বর্ণনা আছে। সে কাহিনীটি এই :—

একদিন পহু আসি, অদ্বৈত মন্দিরে বসি,
বলিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার ॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি, সীতাঠাকুরাণী আসি,
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে,
বোলে কিছু শচীর নন্দন ॥
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায়, যে বাজায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে ॥
এত বলি গোরা রায়, আজ্ঞা দিলা সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণঘট করহ স্থাপনে ॥

কি ভাবে যে বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ হইল, "চৈতন্য ভাগবত"-প্রণেতা বৃন্দাবনদাস তার বর্ণনা করিয়াছেন :—

নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।

তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের বলে, বৈষ্ণব আসিয়া মেলে
কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ ।

এইরূপে মহাপ্রভু নিজে আপনার ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান আস্বাদন করিতেন। তাঁর সমসময়ে বাংলার কৃষ্ণকীর্ত্তনীয়াগণ "তদুচিত গৌরচন্দ্র" বলিয়া যে কোনো পদ গাহিয়া কীর্ত্তনের ভূমিকা বা অবতারণা করিতেন না, ইহা না বলিলেও চলে। এই "তদুচিত গৌরচন্দ্র" গুলি মহাপ্রভূর তিরোভাবের পরেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাগানের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। তবে কত পরে, ইহা বলা সহজ নহে।

"গৌরচন্দ্র" ও "গৌরাঙ্গ-অবতার"

এই "তদুচিত গৌরচন্দ্র' গুলি রচিত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে অবতার-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই "গৌরচন্দ্র" গুলির অধিকাংশই তাহার আশ্রয়ে রচিত। আর মহাপ্রভুর তিরোভাবের পূর্ব্বে কিম্বা তার অব্যবহিত পরেই এই অবতারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। নবদ্বীপেই তাঁর অলৌকিক শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নীলাচলে তাঁর এই শক্তি অনর্পিতচরী ভক্তি-মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। এসকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি যে সামান্য মানুষ নহেন, এ ধারণা অনেকের মনে জন্মিয়াছিল। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহাকে আপনাদের প্রাণের গভীরতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রেমভক্তি দান করিতেন, ইহাও সত্য। কেহ কেহ হয়

ত বা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন, ইহাও সম্ভব। নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে ও নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে তাঁর অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দেখিয়া কাহারো কাহারো মনে তিনি আপনি নারায়ণ, এ ধারণাও জন্মিয়া থাকিতে পারে। তাঁর তিরোভাবের পূর্ব্বেই ভক্তমণ্ডলীর মনে এসকল ভাব শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। কারণ, তাহা না হইলে, ইহার অত্যল্পদিন পরে তাঁর অবতারত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত না। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব সময়েই ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার বলিয়া ভাবিলে বা ভজিলেও, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যে অবতার তত্ত্বটি অভিব্যক্ত হইয়াছে তখনও তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, একথা সহজে বলা যাইতে পারে।

খৃষ্টীয়ান্ ও বৈষ্ণব অবতারবাদ

খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মে ঈশ্বরাবতার বলিতে যাহা বুঝায়, হিন্দুধর্ম্মে ঠিক তাহা বুঝায় না। খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মে যীশুখৃষ্টই একমাত্র ঈশ্বরাবতার। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মে অবতারের ইয়ত্তা নাই। ভাগবত বলিতেছেন—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনির্ধেদ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশ: ॥

হে দ্বিজগণ! যেমন কোনও অক্ষয় জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণের আশ্রয় যে শ্রীহরি তাঁহা হইতে অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ঋষয়ো মানবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

পরম তেজোসম্পন্ন ঋষিগণ, মনুগণ, দেবগণ ও মনুপুত্রগণ ও প্রজা-পতিগণ, সকলেই হরির অংশ বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদের সকলকেই অবতার বলা যায়। হিন্দু এই ভাবে অবতার বস্তুটিকে দেখিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোনও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধক বা সিদ্ধ

মহাপুরুষকে অবতার বলিয়া ভাবিতে বা অবতাররূপে গ্রহণ করিতে হিন্দুর একটুও আটকায় না। আজিও এদেশে কোনও অসাধারণ সাধন-সম্পদসম্পন্ন মহাপুরুষকে দেখিলে লোকে অকুণ্ঠা সহকারে, সরল ও সহজ বিশ্বাসভরে, অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। মহাপ্রভুকে তাঁর আবির্ভাবকালেই অনেকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছু অসম্ভব নহে।

গীতা-ভাগবতের অবতারতত্ত্ব ও চৈতন্যাবতারতত্ত্ব

কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে অবতার তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ভগবদ্গীতার বা শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারতত্ত্ব হইতে এই তত্ত্বটি ভিন্ন। ভগবদ্গীতা যুগাবতারের কথাই বলিয়াছেন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, আর দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। আর যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবানের এইরূপ অবতার হইবার "যুগ" উপস্থিত হয়। এই যুগাবতারের কথাই গীতায় কহিয়াছেন। ভাগবতে এ ছাড়া লীলাবতারের কথাও আছে। যুগাবতার হন, জগতের হিতের জন্য। লীলাবতার হন, ভগবানের নিজের তৃপ্তির জন্য। প্রথমটির প্রয়োজন বাহিরের, লোকসৃষ্টি ও লোকরক্ষা। দ্বিতীয়টির প্রয়োজন ভিতরের, আত্মতৃপ্তি ও আত্মরমণ, আপনাকে আপনি আস্বাদন ও আপনার সঙ্গে আপনি রমণ করিবার জন্য। দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের যে অবতার হইয়াছিল, তাহার প্রয়োজন লোকরক্ষা নহে, কিন্তু লীলা প্রকাশ। এই কৃষ্ণলীলার কথাও ভাগবত গান করিয়াছেন।

প্রাচীন অবতারতত্ত্ব এই পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। আর মহাপ্রভুর

আবির্ভাবকালে যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই প্রাচীন ভাবে ও প্রাচীন আদর্শে তাঁহাকে ভগবানের অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে অবতারতত্ত্বটি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখনও তাহা ভাল করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। হয় ত কেহ কেহ এ আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে আভাসে আর এই প্রকাশে বিস্তর প্রভেদ। ফলতঃ এ আভাসও কতটা ফুটিয়াছিল, ইহা বলা অত্যন্ত কঠিন। এ সম্বন্ধে সমসাময়িক কোনও অকাট্য প্রমাণ আছে কি না, সন্দেহ। অন্যত্রও দেখিতে পাই, কোনও মহাপুরুষের জীবদ্দশায় এসকল অতিলৌকিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। তাঁহাদের তিরোভাবের পরেই, লোকে তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া, এসকল তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে যে তাহা হয় নাই, ইহাই বা কেমন করিয়া বলিব?

কিন্তু যখনই মহাপ্রভুর অবতারত্ব ভক্তগণের অন্তরে প্রকাশিত হউক না কেন, কবিরাজ গোস্বামী ইহার যে নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সেটি অপূর্ব্ব ও অত্যন্ত মধুর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে দুই দিক দিয়া অবতারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; এক জ্ঞানের দিক দিয়া, আর এক ধর্ম্মের বা নীতির দিক দিয়া। এই জগতের উৎপত্তি ও বিকাশের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়া ভাগবত এক অবতারবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান মহদাদিভিঃ
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

"ভগবান লোকসৃষ্টি কামনায় প্রথমে মহত্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, এই সকলের যোগে পৌরুষ বা বিরাট পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করেন।" এই বিরাট পৌরুষ রূপ হইতেই সৃষ্টিধারাতে নানা অবতারের প্রকাশ হয়। এইরূপে বরাহ, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের

প্রকাশ হইয়াছে। এই বিকাশধারাতে ক্রমে সেই বিরাট-পুরুষ "নরদেবত্বমাপন্নঃ"—নরদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন। এই ধারাতেই, বিরাট পুরুষ জনসমাজের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, বলরাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করেন। ভাগবত এই ভাবেই জ্ঞানের দিক দিয়া, অর্থাৎ এই লোকসৃষ্টির মূল ও ক্রম অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া এবং ধর্ম্মের দিক দিয়া, অর্থাৎ লোকস্থিতিভঙ্গ নিবারণের নিমিত্ত, সমাজের উন্নতি বিধানার্থ, ভগবানের বহুবিধ অবতারের কথা কহিয়াছেন। ইহা ছাড়া রসের দিক দিয়া বিশ্বসমস্যা ভেদ করিতে যাইয়া, ভাগবত লীলাবতারের কথাও কহিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এই নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের আশ্রয়েই শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতারের এই অপূর্ব্ব ও অত্যন্ত মধুর তত্ত্বটি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতের লীলাবতারেতে যে বস্তুটি অর্দ্ধেক ফুটিয়াছিল, এখানে সেটি পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যদুনন্দন ও নন্দ-নন্দন

ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা কহিয়া, ভাগবত বলিলেন—এই যে সনৎকুমার হইতে আরম্ভ করিয়া কল্কি পর্য্যন্ত যত বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবতারের নাম করিলাম, আর এসকল ছাড়াও মহাতেজসম্পন্ন অসংখ্য ঋষি, মনু, দেবতা, মনুপুত্র ও প্রজাপতিকে ভগবানের অবতার বলিয়া কহিলাম, ইহারা বিরাট পুরুষের অংশ ও কলা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ আপনি পূর্ণ ভগবান।

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

এই শ্রীকৃষ্ণ কে? বৃষ্ণিবংশজাত যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত "অবতার"-মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরং॥

ঊনবিংশে ও বিংশে ভগবান বৃষ্ণিবংশে রাম আর কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করেন। আর "এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ—এসকল পুরুষের অংশ ও কলা,—এই এতে'র বা এসকলের মধ্যে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ধরিয়া পরে বলিলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। সুতরাং যে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বে বৃষ্ণি-বংশসম্ভূত বলিয়াছেন, যিনি "এতের" মধ্যে পড়িয়াছেন, "স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ" হইতে ভাগবত আপনি তাঁহাকে পৃথক্ করিয়াছেন। অর্থাৎ—ভাগবত বৃন্দাবনলীলার বর্ণনাতে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা কহিয়াছেন, তিনিই "স্বয়ং ভগবান।" তিনিই অবতারী। এই সূত্র ধরিয়াই পরে লঘুভাগবতামৃত কহিয়াছেন—"পরমতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি এক, আর যদুসম্ভূত যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি অন্য। এই যে পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোথাও যান না।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কশ্চিৎ নৈব গচ্ছতি।

এই জন্যই এই বৃন্দাবনলীলা নিত্যলীলা। ইহা নিত্য বলিয়াই সৃষ্টি-ধারার অতীত, ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত বস্তু।

ভগবৎ-স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ বস্তু

ভগবানের এই স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তু। ইহা সৎ, অর্থাৎ আপনি আপনার সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত; ইহা চিৎ ও আনন্দ। চিৎ অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান বলিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ও তদুভয়ের সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা বুঝায়। জ্ঞেয় নাই, অথচ জ্ঞাতা আছে, ইহা হইতেই পারে না। ইহা মাথা নাই যার তার মাথা-ব্যথার মতন অবস্তু, মিথ্যা। আর জ্ঞাতাও আছে, জ্ঞেয়ও আছে, কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নাই, ইহাতেও জ্ঞান সম্ভব হয় না। আর সম্বন্ধ যেখানে সেখানেই ভেদ ও অভেদ দুই আছে। ভেদের ভিতর দিয়াই সেখানে অভেদ, আর অভেদের ভিতর দিয়াই ভেদের প্রতিষ্ঠা হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যদি অভেদ হয়, তবে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার উভয়ের মধ্যে যদি একান্ত ভেদ থাকে,

অর্থাৎ যাহা জ্ঞাতাতে নাই তাহাই যদি জ্ঞেয় ও যাহা জ্ঞেয়েতে নাই তাহাই যদি জ্ঞাতা বলা যায়, তাহা হইলেও জ্ঞানের সম্বন্ধের কোনো ভূমি গড়িয়া উঠে না। জ্ঞান তাহাতে অসাধ্য হয়। জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর ভেদের মধ্যে অভেদের ও অভেদের মধ্যে ভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াই সকল জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

সেইরূপ আনন্দেও ভোক্তা এবং ভোগ্যের সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দের প্রয়োজনে ভোক্তা ও ভোগ্যের এবং এতদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয়। এই সম্বন্ধেতেও ঐ ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এখানেও ভোক্তা ও ভোগ্যের মৌলিক অভেদের মধ্যে আকস্মিক ভেদ ও এই আকস্মিক ভেদকে বিনাশ করিয়া আবার সেই মৌলিক অভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়াই আনন্দ প্রকাশিত ও পরিপূর্ণ হয়।

লীলা-তত্ত্ব

এই দেওয়া-নেওয়া, এই ভেদ ও অভেদ প্রতিষ্ঠা করার নাম লীলা। এখানে সর্ব্বদা এক দুই হইতেছে, আবার এই দুই পুনরায় এক হইতেছে। একের মধ্যে জ্ঞানও নাই আনন্দও নাই, ইহা প্রলয়ের অবস্থা। এক ভাঙ্গিয়া যেই দুই হইতে আরম্ভ করে, অমনি সৃষ্টির সূচনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, আর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও জাগিয়া উঠে। আর জ্ঞান ও আনন্দ যত বাড়ে, যত ফোটে, ততই আবার এই দুই ক্রমে এক হইতে থাকে। জ্ঞানের ও আনন্দের পূর্ণতায় এই দ্বৈত নষ্ট হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও লোপ পায়, আনন্দও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কিন্তু নিত্যজ্ঞানের ও নিত্যানন্দের বিলোপ ত সম্ভব নয়। অতএব যে'ই জ্ঞানের ও আনন্দের পূর্ণতায় জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ও ভোক্তা-ভোগ্য এক হইয়া যায়, অমনি আবার সেই এক ভাঙ্গিয়া দুই হয়। এই ভাঙ্গাগড়া, এই এক হওয়া ও দুই হওয়া, এই মিলন ও বিচ্ছেদ,

ইহাই লীলার নিত্য ধর্ম্ম। নিত্য লীলাতে, সে লীলা জ্ঞানের লীলা হউক, আর প্রেমের বা আনন্দের লীলা হউক—এই জন্য নিত্য বিচ্ছেদ ও নিত্য মিলন লাগিয়া আছে। ইহাই ভাগবত বর্ণিত নিত্য লীলার মূল তত্ত্ব। কাব্যাকারে ও নাট্যাকারে মহাকবি এই লীলাতত্ত্বটিই অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রকৃতি-পুরুষ বা রাধা-কৃষ্ণ

ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই আছে। জ্ঞাতা ও ভোক্তাকে বিষয়ী আর জ্ঞেয় ও ভোগ্যকে বিষয় বলা যাইতে পারে। আবার পুরুষই বিষয়ী, প্রকৃতিই তাঁর বিষয়। এই পুরুষ ও প্রকৃতি একই সত্তা বা সত্য বা বস্তু, একই তত্ত্ব। সত্তাতে, বস্তুতে, তত্ত্বেতে দুই' এক। প্রকাশেতে কেবল দুই। সত্তাতে অদ্বৈত, প্রকাশে দ্বৈত। সত্তাতে অভেদ, প্রকাশেতে কেবল ভেদ। শ্রীকৃষ্ণই এই অদ্বয়তত্ত্ব। ভাগবত ইঁহাকেই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু বলিয়াছেন। আর শ্রীরাধা এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুরই জ্ঞেয় ও ভোগ্য। নিতজ্ঞানের জ্ঞেয়ও নিত্য হইবে। পূর্ণজ্ঞানের বিষয়ও পূর্ণ হইবে। জ্ঞেয় যত জ্ঞাতার অনুরূপ হয়, ততই তাহাকে জানিয়া তার জ্ঞাতৃত্ব সার্থক হইয়া থাকে। আনন্দ সম্বন্ধেও এসকল কথা খাটে। নিত্যানন্দের ভোগ্যও নিত্য হওয়া চাই। পূর্ণানন্দের বিষয়ও পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। ভোগ্য যত ভোক্তার অনুরূপ হন ততই এই ভোগ্যকে আশ্রয় বা সম্ভোগ করিয়া তিনি তাঁর নিজের আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে ভগবান তাঁর প্রকৃতিরও নিত্য এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁরই অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। শ্রীরাধিকা এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বার্থসাধিকা; তাঁর জ্ঞানের ও আনন্দের পরিপূর্ণ বিষয় ও অবলম্বন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই সমতুল, তাঁরই সম্পূর্ণ উত্তর-সাধিকা। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ যাহা চায়, শ্রীরাধিকাতে তাহাই

একশ' একষট্টি

পায়। আবার শ্রীরাধিকা যাহা চান, শ্রীকৃষ্ণেতে তাহাই পান। মোটামোটি ইহাই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

জ্ঞানলীলা ও আনন্দলীলা বা রসলীলা, উভয়বিধ লীলার আত্ম-প্রয়োজনেই পুরুষ ও প্রকৃতির মৌলিক একত্বের মধ্যে একটা দ্বৈতের ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। কিন্তু ঐ একত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, এই দ্বৈত সর্ব্বদা আবার অদ্বৈতমুখী হয়, আপনাকে আপনি কি করিয়া নষ্ট করিবে, তার চেষ্টা করে। আর এই স্বাতন্ত্র্য এবং পরিচ্ছিন্নতাও, এই কারণে, মূলের অদ্বৈত-তত্ত্বের আকর্ষণে, সর্ব্বদাই আত্মবিলোপ করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে আপনার মূল আশ্রয়ের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইবার জন্য লালায়িত হয়। জ্ঞানলীলার ও আনন্দলীলার এই যে দ্বৈত ও স্বাতন্ত্র্য, তাহাকে ধরিয়াই ভাগবতে রাধাকৃষ্ণের রসলীলার বর্ণনা হইয়াছে। আর কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভাগবতের রাধাকৃষ্ণলীলাতে যেটুকু ফোটে নাই, যেটুকু অপূর্ণ ছিল, তাহাকে ফুটাইয়া ও পূর্ণ করিয়া, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত অবতার-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভাগবত ও চরিতামৃত

ভাগবতে রাধাকৃষ্ণকে দ্বৈতভাবে দেখিতে পাই। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও দুই। শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীরাধা ভিন্ন দেহে প্রকাশিত ও বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাগতপ্রাণ হইয়াও ভিন্ন দেহে অধিষ্ঠিত। সত্তাতে, তত্ত্বেতে এক হইয়াও প্রকাশে, অধিষ্ঠানেতে ইহারা দুই। পরমতত্ত্ব কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু। তাঁর মধ্যে এই দ্বৈত কখনও নিত্য হইতে পারে না। দ্বৈত একটা সাময়িক প্রকাশ বা ক্রিয়া বা বিকার মাত্র। ইংরাজি দর্শনের পরিভাষায় ইহাকে অদ্বৈতের moment মাত্র বলা যাইতে পারে। ভাগবত এই সাময়িক তত্ত্বটিকে ধরিয়াই অপূর্ব্ব কৃষ্ণলীলার প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরঙ্গ-অভিজ্ঞতাতে, জ্ঞান

ও প্রেমের প্রকৃতিতে এই দ্বৈত প্রকাশিত হইয়া, কেবলই অদ্বৈতে মিলিয়া মিশিয়া যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে; আর যতক্ষণ না আবার এক হইয়াছে, ততক্ষণ কি জ্ঞান, কি রস বা আনন্দ, দু'এর কোনটিই পূর্ণ হয় না। যে মূলে এক ছিল, মাঝখানে কেবল দুই হইয়াছে, আর দুই হইয়া কেবলই ঐ মূলের একত্বকে পাইবার জন্য পিপাসিত হইয়া আছে, সে আবার এক হইবেই হইবে। না হইলে, এই ক্রম, এই লীলা, পরিপূর্ণ ও সফল হয় না। ভাগবত-চিত্রিত বৃন্দাবন-লীলাতে অদ্বৈততত্ত্বের আত্মলীলার মধ্যম অঙ্কের অভিনয় মাত্র প্রকটিত হইয়াছে। ইহার শেষ অঙ্ক ত আছে। সেই শেষ অঙ্কের অভিনয় প্রকট হইল কোথায়? শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ কহিলেন—"এখানে, এই বাংলা দেশে, এই নববৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপধামে আর নীলাচলে।" কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যাবতারের এই অর্থ করিয়াই আপনার গ্রন্থের সূচনায় "বস্তুনির্দেশস্বরূপ মঙ্গলাচরণে" কহিয়াছেন :—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাব দ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

"শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-রূপিণী যে হ্লাদিনী শক্তি তাহাকেই শ্রীরাধা কহে। অতএব শক্তি ও শক্তিশালী এক বলিয়া, রাধাকৃষ্ণও বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন। ইহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও পুরাকালে এই ভুবনে (বৃন্দাবনধামে) ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। অধুনা ঐ দুই তত্ত্ব একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকটিত হইয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপবস্তু, কিন্তু শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুগঠিত। এই শ্রীচৈতন্যাখ্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকাররূপিণী যে হ্লাদিনী-শক্তি, তাহাকেই শ্রীরাধা কহিয়াছেন। এই বিকারের অর্থ কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ ইক্ষুরসের বিকারকে 'ওলা' বা মিছরি কহিয়াছেন। ইক্ষুরস আপনার স্বরূপকে অব্যাহত রাখিয়া এই ওলা বা মিছরিরূপে পরিণত হয়। মিষ্টত্ব ইক্ষুরসের স্বরূপ। ওলার মধ্যে এই স্বরূপটি ঠিক আছে; কিন্তু ঘনীভূত ও দানাদার আকার ধারণ করিয়াছে। অতএব—বস্তুর নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপ অব্যাহত থাকিয়া, অন্য বস্তুর সঙ্গে কোনো প্রকারের যোগাযোগ ব্যতীত, যদি ভিন্ন আকারে পরিণত হয়, তবে এই পরিণামকে বিকার কহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের এইরূপ বিকারই শ্রীরাধা। স্বরূপতঃ শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহেন; তবে ভিন্ন আকার ধরিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।

দেখিয়াছি যে এই সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব নিতান্ত অদ্বৈত বা ভেদরহিত কিম্বা একান্ত দ্বৈত বা ভেদসমন্বিত নহে। ইহাতে ভেদের মধ্যে অভেদ, আর অভেদের মধ্যে আবার ভেদ রহিয়াছে। এই তত্ত্ব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব। জ্ঞান-প্রয়োজনে এই ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চিৎ-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আনন্দের বা প্রেমের প্রয়োজনেও এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার আনন্দ-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পরমতত্ত্ব চিদ্বস্তু। অর্থাৎ এই চৈতন্যে বা জ্ঞানে তাঁহার সত্তার প্রতিষ্ঠা। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

অর্থাৎ পরমতত্ত্বের সকলই চৈতন্যময়। আঘাত পাইলেই প্রতিঘাত করে, ইহাই চৈতন্যের সাধারণ ধর্ম্ম। যাহার এই প্রতিঘাতের শক্তি নাই, তাহাকেই লৌকিক ভাষায় আমরা অচেতন পদার্থ কহি। বিশ্বে কোনো পদার্থেরই এই প্রতিঘাত-শক্তি যে নাই, ইহা বলা কঠিন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অপূর্ব্ব আবিষ্কারের পরে, আধুনিক জড়-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সাহস করিয়া বিশ্বের কোনো পদার্থের যে এরূপ প্রতিঘাত করিবার শক্তি নাই, আর এমন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু অচেতন পদার্থ বলিয়া জগতে কোনো কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, যে বস্তু আঘাত পাইলে সাড়া দেয়, তাহাকেই আমরা সচেতন বলি। সুতরাং

একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।—

ইহাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী, আর সম্বিৎ—এক চিৎশক্তির এই ত্রিবিধ স্বরূপকে কিছুতে অচেতন বলিতে পারি না। আমরা সচরাচর শক্তি আর শক্তিমান, এই দুইকে পৃথক করিয়া কল্পনা করি। আর যখন এরূপ পৃথক করিয়া ভাবি, তখন এই শক্তি মনের ভাব-মাত্রে বা ideaতে পরিণত হয়। এই ভাবকে আমরা সচেতন বলিয়া ভাবিতে পারি না। ভগবানের এই যে ত্রিবিধ শক্তির কথা হইল, হঠাৎ তাহাকেও আমরা এইরূপ একটা মানসবস্তু বলিয়াই ধরিয়া লই। শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব, প্রভৃতি, কিম্বা সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য, কারুণ্য প্রভৃতি যেমন আমাদের নিকটে মনের ভাবমাত্র, সেইরূপ ভগবানের এই হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎকেও আপাতত কেবল একটা মনোভাব বলিয়া মনে হয়। আর ঠিক এটি যাতে আমরা মনে না করিতে পারি, তারই জন্য এখানে কবিরাজ গোস্বামী প্রথমে—

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥

এই কথা কহিয়াছেন। হ্লদিনী প্রভৃতি একই চিৎ-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা প্রকাশ। অতএব এই হ্লাদিনী প্রভৃতিও চিদ্বস্তু। আধুনিক ভাষায় আমরা যাহাকে শক্তি বলি, হ্লাদিনী ঠিক তাহা নহে। চৈতন্যসম্পন্না শক্তিকে আমরা শুধু শক্তি বলি না, তাহাকে জীব কহি। যে-শক্তির চৈতন্য নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে জড়-শক্তি কহিয়া থাকি। হ্লাদিনী পূর্ণ-সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-শক্তির রূপ বলিয়া, তাহা কেবল মনোভাব নহে, আর অচেতন জড় শক্তিও নহে। ইংরাজিতে ইহাকে শক্তি বা force বলিতে পরি না, ব্যক্তি বা person বলিতে হয়। ভগবান স্বয়ং যেমন কেবল একটা মনোভাব—logical abstraction—নহেন, কিন্তু পুরুষ, person; সেইরূপ তাঁর এই যে হ্লাদিনী-শক্তি ইহাও কেবল মানসবস্তু, logical abstraction অথবা psychological generalisation নহে, কিন্তু person—একটি বিশিষ্ট সচেতন বস্তু। ভগবান আপনি যেমন স্বাভাবিকী-জ্ঞানবলক্রিয়া-সম্পন্ন, এই হ্লাদিনী-শক্তি-রূপিণী শ্রীরাধাও সেইরূপ স্বাভাবিকী-জ্ঞানবলক্রিয়াসম্পন্না। এই জন্য ভগবানের সঙ্গে তাঁর ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদান-প্রদান, উত্তর-প্রত্যুত্তর, জ্ঞান-ভাব ও কর্ম্মের বিনিময় চলে। যদি বল, তাহা হইলে ভগবৎস্বরূপের একত্ব ও অদ্বৈতত্ব নষ্ট হইয়া যায়; তাহা হইলে জীবের সঙ্গেও ত ভগবানের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এই আদান-প্রদান, এই উত্তর-প্রত্যুত্তর, এই জ্ঞান-ভাব ও কর্ম্মের অন্যোন্য সম্বন্ধ আছে। ইহাতে যদি ভগবানের অদ্বৈতত্ব, বা অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ নষ্ট না হয়, শ্রীরাধিকার সঙ্গে ইহার অনুরূপ সম্বন্ধেতে তাহা নষ্ট হইবে কেন? ফলতঃ যে পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের উপরে এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে শ্রীরাধাতে আর জীবেতে সজাতীয় ভেদমাত্র আছে, বিজাতীয় ভেদ নাই। ভগবানের অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁর নিত্য-স্বরূপের মধ্যেই, নিত্য অন্তরঙ্গ লীলা-প্রয়োজনে

তাঁর প্রণয়বিকাররূপিণী হ্লাদিনী-শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই অপূর্ব্ব ভাগবতী লীলার কথা প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্বের আশ্রয়েই, বাংলার বৈষ্ণব-সাধনে রাধাকৃষ্ণের লীলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥

শ্রীকৃষ্ণ-পরমতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। বলিয়াছি যে ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধেতে আনন্দের প্রতিষ্ঠা, এই সম্বন্ধ ব্যতীত আনন্দ অসম্ভব ও অসাধ্য। আনন্দ-স্বরূপ ভগবানের মধ্যে এই ভোক্তাভোগ্য সম্বন্ধ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। আর তাঁর প্রণয়ের বিকার-রূপিণী হ্লাদিনী শক্তিই এখানে ভোগ্য। এই জন্য—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।

কিন্তু ভগবান আত্মারাম। তিনি তাঁর নিজের প্রেমেই নিজে আস্বাদন করেন। তাঁর ত কোনো বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা নাই। থাকিলে তিনি পূর্ণ-তত্ত্ব ও অদ্বৈত-তত্ত্ব হইতেন না। সুতরাং তাঁর ভোগের বা আনন্দের বিষয় তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু তাঁর নিজের প্রেমের উপাদানেই নির্ম্মিত।

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণমণি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা, ক্রীড়ার সহায়॥

জ্ঞানের দিক দিয়া, জ্ঞানের বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন :—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরিমাণ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥

"রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি"—ইত্যাদি শ্লোকই এই পঞ্চম শ্লোক। আর ইহাতে জ্ঞানের দিক দিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর অবতার-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চৈতন্যাবতার ও রসতত্ত্ব

পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শ্লোকেতে রসের দিক দিয়া এই অবতার-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, এই ষষ্ঠ শ্লোকে তার প্রয়োজন প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা।
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ॥
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা।
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইলেন। কেন?—না, তিনটি প্রয়োজনের প্রেরণায়। প্রথম—শ্রীরাধা তাঁহাকে যে প্রেম করেন, সেই প্রেমের মহিমা কীদৃশ, ইহা জানিবার লোভে। দ্বিতীয়—এই প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধিকা তাঁহার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কীদৃশ, ইহা আস্বাদন করিবার লোভে। তৃতীয়—শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধা যে সুখপ্রাপ্ত হন, সেই সুখই বা

কীদৃশ, ইহা অনুভব করিবার লোভে। এই ত্রিবিধ লোভ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ শচীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ী, তিনি জ্ঞাতা ও ভোক্তা। শ্রীরাধিকা তাঁর ভোগ্য, তাঁর আনন্দের আশ্রয়। আর তিনি শ্রীরাধার আনন্দের বিষয়। কিন্তু রসের সম্বন্ধেতে আমরা একদিক মাত্র প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎভাবে আস্বাদন করি, অন্যদিক আমাদের অনুভবের ও আস্বাদনের অতীত থাকিয়া যায়। সখ্য সম্বন্ধেতে সখাকে আশ্রয় করিয়া আমি যে রস আস্বাদন করি, তাই কেবল বুঝি ও জানি; আমাকে আশ্রয় করিয়া সখা কি রস আস্বাদন করেন, তার প্রত্যক্ষ অনুভব ত আমার হয় না। বাৎসল্যে মার নিজের প্রাণ সন্তানের জন্য কি করে, তাই কেবল জানেন; সন্তানের প্রাণ তাঁর জন্য কি করে, ইহা ত জানেন না।

পতি-পত্নী সম্বন্ধেও ইহা সত্য, বোধ হয় আরও বেশী সত্য। আমরা পুরুষ, সতীর অকৈতব প্রেম আস্বাদন করিয়া অমোদের দেহমনপ্রাণে কি অনুভব হয়, তাই কেবল জানি ও বুঝি; আমাদের প্রেমাস্বাদনে সতীর দেহমনপ্রাণ যে কি করে, তাহার সাক্ষাৎ অনুভূতি ত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়! আমরা তার কিছুই বুঝি না। অথচ ঐটির প্রত্যক্ষ অনুভব লাভের জন্য আমরা লালায়িত হই। ঐটি না জানিলে আমাদের রস ও আনন্দ যেন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহা রসের নিত্য ধর্ম্ম। জ্ঞান যেমন দ্বৈত-প্রতিষ্ঠা করিয়া আবার নিয়ত সেই দ্বৈতকে নষ্ট করিতে চায়; রস সেইরূপ কেবল নিজের আনন্দানুভূতিতে তৃপ্ত হয় না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করে, সে কিরূপ আনন্দ অনুভব করে বা করিয়া থাকে, তাহাও জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়। আর এই ব্যাকুলতা বা লোভকে ধরিয়াই কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর অবতারের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো"—ইত্যাদি শ্লোকে এই রসতত্ত্বটিই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"রসো বৈ সঃ"

শ্রুতি যাঁহাকে—"রসো বৈ সঃ"—কহিয়াছেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। "রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি"—এই রসস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর রস পাইয়াই জীবসকল আনন্দিত হয়। এই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের কণামাত্র পাইয়া সমুদায় জীব জীবনধারণ করে। এই আনন্দ না পাইলে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ—কেইবা জীবনধারণ করিত, কেইবা প্রাণচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইত? এই সকল প্রাচীন শ্রুতির অনুসরণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥

কিন্তু এমন জন আছে দেখিতেছি, সে শ্রীরাধা। আমি এক শ্রীরাধাতেই এই আনন্দ অনুভব করি।

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশীগীতে আকর্ষে ভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ-গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ॥

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥

কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি? শ্রীরাধিকাতে শ্রীকৃষ্ণ যে সুখ ও আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীরাধা তাঁহাতে তদপেক্ষা কোটী গুণ বেশী আনন্দ প্রাপ্ত হন।

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অচেতন॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন (১)।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
"কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে"।
এই সুখে মগ্ন রহে, বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হৈয়া অন্ধ॥
তাম্বূলচর্চ্চিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে ডোবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
লীলা-অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গের মাধুরী!
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরী॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥

(১) আমি বাঁশী বাজাই বলিয়া, বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হইয়া যখন আপনি বংশীধ্বনি হয়, তাহাতে পর্য্যন্ত শ্রীরাধিকাকে আমার ভাবভাবিত করিয়া অচেতন করিয়া ফেলে।

তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা, তাঁরে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য প্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥

এই লোভতৃপ্তির একমাত্র উপায় আছে। রাধিকা না হইলে, রাধিকা কি সুখ পান, ইহা বুঝা অসম্ভব ও অসাধ্য। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা অনুভব করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত। আর এই প্রণয়ের দ্বারা শ্রীরাধা তাঁর যে মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই আস্বাদন পাইবার জন্যও শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত। আর শ্রীকৃষ্ণের অনুভবে শ্রীরাধার কি সুখ হয়, তাহাও অনুভব করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই তিন তৃষ্ণা নিত্য-কাল আছে। আর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ভাবেন—

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব, কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
এই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি, ধরি তাঁর বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥"

কৃষ্ণ-লীলা ও গৌরাঙ্গ-লীলা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণের সিদ্ধান্তে ইহাই মহাপ্রভুর অবতারের নিগূঢ় প্রয়োজন ও মর্ম্ম। দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে দুই ভিন্ন দেহেতে রাধাকৃষ্ণের যে লীলা প্রকাশিত হইয়াছিল, এই কলিযুগে শ্রীশ্রীচৈতন্যা-বতারে, এই বাংলাদেশে, নবদ্বীপে ও নীলাচলে, বিশেষতঃ নীলাচলে, একই দেহেতে সেই অপূর্ব্ব প্রেমলীলার পুনরভিনয় হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই মহাপ্রভুর ভজনাদি করিয়া থাকেন।

রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা নিত্য হইলেও, কলিতে অপ্রকট হইয়া গিয়াছিল। কচিৎ কোনো ভাগ্যবান সাধক আপনার নিগূঢ়তম অন্তরঙ্গ অনুভূতিকে এই লীলা প্রত্যক্ষ এবং আস্বাদন করিলেও, জনসাধারণের নিকটে ইহার যাথার্থ্য ও মর্ম্ম লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপনার জীবনে পুনরায় এই লীলাটিকে প্রকট করিয়া তুলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মহাপ্রভুর মধ্যে, তাঁহার কথাবার্ত্তায়, ভাবস্বভাবে, আচার আচরণে, তাঁহার দেহেতে যে সকল সাত্বিকীবিকার প্রকাশ হইত তাহার আশ্রয়ে, ঐ প্রাচীন পৌরাণিকী লীলার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভ করিয়া, কৃষ্ণলীলা বস্তুটি সত্য সত্য যে কি, ইহা বুঝিয়াছিলেন। এই প্রত্যক্ষ গৌরাঙ্গলীলা অপ্রত্যক্ষ কৃষ্ণলীলার নিগূঢ় রস-ভাণ্ডারের চাবিটি যেন তাঁহাদের হাতে দিয়াছিল। এই প্রত্যক্ষ গৌরাঙ্গ-লীলার অভিধানে তাঁহারা কৃষ্ণলীলার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারিয়াছিলেন।

অনুবাদ ও বিধেয়

আর এই জন্যই মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে, তাঁহার ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণ লীলাগান করিবার সময় এই গৌরাঙ্গ-লীলাটি স্মরণ করিয়া থাকেন।

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।

অনুবাদ আগে না কহিয়া বিধেয় কহিবে না। কহিলে বিধেয়ের মর্ম্ম প্রকাশিত হইবে না, হইতে পারে না। আর

বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত॥

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকটে তাঁর লীলাটি জ্ঞাত ছিল।

কৃষ্ণলীলা ছিল অজ্ঞাত। এই কৃষ্ণলীলাই মহাজনপদের বিষয়। পদাবলী কীর্ত্তনে ইহা বিধেয়স্বরূপ। অতএব মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে তাঁর ভক্তগণ কৃষ্ণলীলা গান করিবার সময়, আগে অনুবাদস্বরূপ গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন করিয়া, পরে বিধেয়স্বরূপ কৃষ্ণলীলা গান করিতেন। ইহাই "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" আদিম, মুখ্য ও সত্য অর্থ।
